Palette 2017

2nd Year, 2nd Edition

An SEPAI Theatre Publication

Society for Energizing Performing Arts among every Indian

এনাদ নাট্যগোষ্ঠীর নিবেদন

চলমান অশরীরী

নাটক- জ্যোতিস্মান চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা- অমিতাভ বকসী

December 16th, Saturday, 4:00 pm & 7:00 pm

January 14th, Sunday, 4:00 pm & 7:00 pm

venue: ADA Rangamandira

Palette 2017

2nd Year

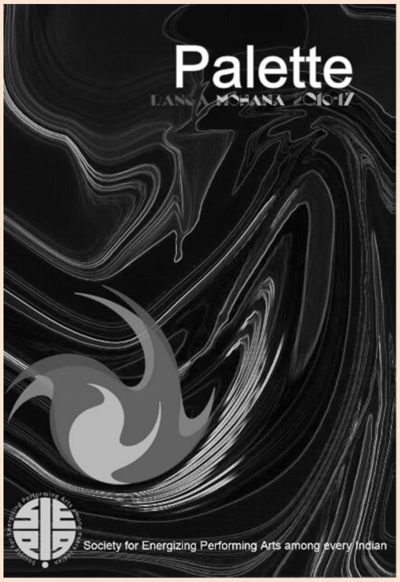

An SEPAI Theatre Publication

Water color painting on the Cover Page : Sangeeta Ghoshal

Magazine Coordinator : Swapna Bandyopadhyay

16th December 2017

Palette :: This Edition

- প্রচ্ছদে জলরঙে আঁকা অসামান্য ছবি। শিল্পী : সঙ্গীতা ঘোষাল
- একান্ত আলাপচারিতায় অভিনয় এবং চরিত্র নির্মাণের নানান কৌশল জানালেন স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব -
  - দেবশঙ্কর হালদার
  - অনির্বাণ চক্রবর্তী
  - রাহুল সেনগুপ্ত
- Legendary নট ও নাট্যকার শ্রী শম্ভু মিত্রের জীবন ও চরিত্র নির্মান বিষয়ক দুর্লভ কিছু তথ্য জানালেন সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়
- পুরানো দিনের বাংলা নাটক ও নাট্যব্যক্তিত্বের সত্যি গল্প শোনালেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
- কন্নড় থিয়েটারের নানান কথা বললেন রঞ্জন ঘোষাল
- On intentntion from Abhishek Majumder
- মঞ্চ ও মহড়া নিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বললেন শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায়
- রইলো নিজস্ব অনুভূতি ও নাটকের অভিজ্ঞতা নিয়ে এনাদ সদস্যদের নানান স্বাদের বেশ কটি লেখা
- এছাড়াও থাকলো আমাদের (SEPAI) গত এক বছরের দিনপঞ্জী

আমি ও নাটক - স্বনামধন্য অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার এর সাথে আলাপচারিতা

- নাটক সম্পর্কে ভালোবাসা অথবা দৃষ্টিভঙ্গী।

আমি ছোট থেকে বড়ো হয়েছি নানান বাঁকের মধ্যে দিয়ে। প্রথমে ফুটবলার হওয়ার ইচ্ছে ছিলো তারপর ইলেভেন- টুয়েলভে লেখালেখি করতাম, ম্যাগাজিন বার করতাম—ভাবতাম লেখক হবো। কলেজে ছাত্র রাজনীতিও করেছি এবং অনেক দূর অবধিই করেছি। তখন মনে হতো মানুষের জন্যে কাজ করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। ক্রমে সেখানে নিজেকে আনফিট লাগতে শুরু করলো। যেহেতু আমার বাবাও যাত্রার নাম করা অভিনেতা ছিলেন তাই আমার বেড়ে ওঠা, আমার জীবনধারণের সমস্ত সামগ্রী, অর্থ সবই তো অভিনয়ের টাকা থেকেই হয়েছে। কিন্তু বাবা অভিনয় করতেন বলেই আমাকে অভিনয় করতে হবে এমন কোন মনোভাব আমার তখন ছিলো না। বরং উল্টোটাই ছিলো। পরিচিত অনেকেই জিজ্ঞাসা করতেন তুমিও কী ঐ অভিনয় লাইনেই যাবে? মোটেই ভালো লাগতো না। মনে হতো অভিনয় নয়, অন্য কোন কাজ করবো। কিন্তু অভিনয় যে আমার দেখতে খুব ভালো লাগতো! ছোটবেলা নিজেও তো পাড়ায়, স্কুল, কলেজে কখনো- সখনো অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি। কলেজ থেকে বেরোবার পর নান্দীকারের ওয়ার্কশপের একটা অ্যাড দেখলাম। উৎসাহী হয়ে গিয়েছিলাম ওয়ার্কশপ করতে। ভেবেছিলাম দেখি না কেমন করে নাটক তৈরি হয়, নাটকের ভেতরের ব্যাপার-স্যাপারগুলো কী! সবাই যখন চাকরি করতে যাচ্ছে আমি ওই করতে গিয়েছিলাম। তখন ৮৬ সাল। সেই প্রথম নাটকে ঢোকা, তারপর ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়া। এরপরে মনে হয় একমাত্র এই কর্মকান্ডের মধ্যেই আমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি, যেভাবে চাইছি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছি। ভেবেছিলাম অভিনয়ের সাথে সাথে চাকরিও করবো। অনেকে যা করেন। কিন্তু দেখলাম অভিনয়ের কাজে অনেক সময় চলে যাচ্ছে আর চাকরীর থেকে অভিনয়টাই আমার বেশি ভালো লাগতে শুরু করেছে। এভাবেই চাকরির দৈনন্দিনতার কাছে ফেরার পথ আমি নিজেই কখন বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন যে আমি থিয়েটার করি কারণ নিজেকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলে খুব খুব আনন্দ হয়। মনে হয় নিজেকে এক্সপ্লেন করা গেলো খানিকটা, মনে হয় এই চলতে থাকা জীবনের নিজস্ব চেহারার বাইরে অন্যকিছু আবেগ, অনুভবের মধ্যে ঢোকা গেলো। ৩২ বছর এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছি। এখনো এ শিল্পে আমার দায়িত্ব, আমার ভূমিকা পালন করছি।

- কোন চরিত্র নির্মাণে কেমন অধ্যায় পার হতে হয়--

এভাবে কতোটা বোঝাতে পারবো জানিনা। ধরুন, কেউ গান করছেন, তাকে কী কী ভঙ্গিমায় গান করছেন জিজ্ঞাসা করলে তাকে প্রথমে সুর লাগাতে হবে, সেইভাবে সুর লাগাতে গেলে সেটা তাকে প্র্যাক্টিক্যালি দেখাতে হবে। আমার ক্ষেত্রেও তাই। আমি বলবো ঠিকই কিন্তু এটা হয়তো তাত্ত্বিক কথা হয়ে যাবে।

একজন অভিনেতা নানাভাবে একটা চরিত্রকে ২০০ বা ২০০০ রকমভাবে চরিত্রায়ন করে। আমার ক্ষেত্রে প্রতি চরিত্রের একটা শারীরিক উপস্থিতি থাকে। তার হাঁটাচলা, দাঁড়ানো, বসা—তার একটা নিজস্ব ভঙ্গী থাকেই। সেই

উপস্থিতিকে মহড়ায় তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ অভিনেতা ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে যা তার বাইরে চরিত্রটির কাছাকাছি একটি শারীরিক পরিস্থিতিকে উপস্থিত করতে হয়। সেই ফিজিক্যাল প্রেজেন্স সম্পর্কে কিন্তু নাটকের স্ক্রিপ্টেই বলা থাকে যে এ চরিত্র একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ায় বা একটু এলোমেলোভাবে হাঁটে বা ওই মানুষটি হয়তো ছটফটে। এই যে ছটফটে শব্দটা, ওইটা থেকেই ধরে নিতে হবে মানুষটা কিভাবে হাঁটবে, দাঁড়াবে, নাটকে চরিত্র- শরীরকে গঠন করবে। তাছাড়া চরিত্রটির বয়স। নাটকে যে বয়স থাকে সেটাকে চরিত্রে উপস্থিত করা , আর তা যদি বাড়তে থাকে তাহলে তাকে ধারণ করা। চরিত্রের বয়স তাকে একটা ভার দেয়। ওজনের তারতম্য, মনের তারতম্য এই বয়স অনুযায়ী গঠন করতে হয়। অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন অর্থাৎ সমাজের কাছে সে নিজেকে কিরূপে প্রকাশ করতে চাইছে এগুলোও খুব প্রয়োজনীয়। আর খুঁজতে হয় চরিত্রের মেজাজ। সে কোন মেজাজের লোক তা প্রকাশ করতে হয় নাটকে। অন্তত আড়াই হাজার রকম পদ্ধতিতে একটা চরিত্রের কাছে পৌঁছানো যায়।

■ এক চরিত্রের ছায়া অন্য চরিত্রে কতখানি পড়ে—

ছায়া তো ফেলেই। নিশ্চয়ই ফেলে। ধরুন, দু'টো ভিলেন চরিত্রে একই সময়ে আমি অভিনয় করছি, দু'জন ভিলেন হলেও তারা কিন্তু এক লোক নয়। একজন হয়তো টালির ঘরে থাকে, অন্যজন কংক্রিটের বাড়িতে। একজন রাম, অন্যজন শ্যাম বা রহিম। ধরুন, দু'জনেই হয়তো কাছাকাছি মনোভাবের তবু আলাদা করা যায়। করতেই হয় । ওটাই অভিনয়। ওই যে বললাম মেজাজ, বয়স...। দু'জনেই দুষ্টুলোক কিন্তু দু'টো দুষ্টুলোকের মধ্যে কিছু তফাত তো থাকেই। আর দু'টো নাটক যখন, তখন তার ঘটনা আলাদা, প্রকাশ আলাদা। কিছু ছায়া থাকলেও তা আলাদা করা যায়।

■ খারাপ নাটক, ভালো নাটক।

যে কোন শিল্পকলা গান, নাটক, কবিতা, ছবি, মূকাভিনয় চলচ্চিত্র – আসলে এরা যোগাযোগ করতে চায় পাঠক, দর্শক, শ্রোতার সাথে। যে নাটক, গান, ছবি নিয়ে সে হাজির হয়েছে সেটা যেন ভোক্তাদের ছুঁয়ে যায়, তাকে যেন কোন অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দেয় এটাই তার উদ্দেশ্য থাকে। সেই মনে করিয়ে দেওয়াটা যখন সে সত্যিই পেরে ওঠে তখনই ভালোলাগার পর্বটা শুরু হয়। মানে ভোক্তার অভিজ্ঞতার সাথে মিলঅবে, না হয় অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে তাকে কোথাও একটা ধাক্কা দেবে। এটা যখনই হয় তখন আমাদের তুষ্টি ঘটে। আর ভাল খারাপটা ওভাবে বিচার করা খুব মুশকিল। কোনো একটা নাটক হয়তো আমার ভালো লাগলো না কিন্তু সেটা অন্য কারোর বেশ ভালো লেগেছে তা বহুবার দেখেছি। সুতরাং ভালো লাগাটা ভীষণ আপেক্ষিক। তবে সেসব শিল্প বা নাটকের কথা বলছি না যেগুলো নির্মাণে কোন যত্ন থাকে না বা দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু যেগুলো ভালোর পথে এগিয়েছে অর্থাৎ সংযোগ তৈরি করতে পারছে , সে অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক অর্থ নিয়েই মানুষের সাথে যোগাযোগ তৈরি করতে পারছে সেসব নাটককে তো ভালো বলতেই হবে তাই না?

■ মঞ্চ ব্যবহার এবং ভয়েস...

মঞ্চ হলো আমরা যে সমাজে বাস করছি সেই সমাজেরই একটা ছোট জায়গা যেখানে আমরা আমাদের গোটা পৃথিবীটাকে তুলে আনবো। যদি সেটাই সত্য বলে মনে করি তাহলে মঞ্চের পাটাতন আর কাঠ থাকে না, ক্রমশ বিশ্বাসের একটা জায়গায় পরিণত হয়। এটা আমার বাড়ি, এটা আমার ঘর, এটা রেললাইন, এটা অফিস—এই বিশ্বাসটাই জোরালো হয়ে ওঠে। নিজের মনে মাধুরি মিশিয়ে তাকেই আমারা, অভিনেতারা, দৃশ্যে দৃশ্যে পাল্টে

ফেলি। আর গলার ব্যাপারে বলবো, নাটকে কিছু টেকনিক্যাল স্কিল তৈরি করতে তো হয় বটে কিন্তু মন যদি প্রস্তুত থাকে তাহলে গলাও ঠিক থাকে। এরজন্যে চাই রিল্যাক্সড থাকা। মনের ব্যবহারের সাথে রিল্যাক্সেশন। এই দু'টো একসাথে থাকলেই গলার স্বর আপনাআপনি নিজের আয়ত্ত্বে থাকে। তবে গলার রেঞ্জ বাড়াতে হলে রোজ রেওয়াজ করাটা খুব জরুরী। আমিও রোজ তা করি।

- 'ফেরা' নাটকের চরিত্রটির ব্যাপারে...

আমি চরিত্রটাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। ওর স্বভাব, শঠতা, লোভ, পাপবোধ... এগুলো। আগের নাটকগুলোতে যে ম্যাজিক তৈরি হয়েছে পরের নাটকগুলোকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতেও নেই। সেই কারণে ফেরার ভিলেন যে অন্যায় করেছে পরে একসময় সেই অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করেছে। এই নাটকের ৭৫ টি শো হয়ে গেছে। অনেকের এই নাটক ভালো লেগেছে কারণ এই চরিত্রের ধরণটা অন্য। কোন হিরোইজম, লার্জার দ্যান লাইফ বা মজা ইত্যাদির বাইরে অন্য কিছু তারা খুঁজে পেয়েছে।

[দেবশংকর হালদার—বাংলা নাটকে বর্তমান সময়ে তিনিই শেষ কথা। অভিনয়ই তাঁর যাপন। অভিনয় সম্পর্কিত বিভিন্ন পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে। তাঁর নামে নাট্য উৎসবের আয়োজন হয়। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও তিনি সমান জনপ্রিয়। বাবা অভয় হালদার ছিলেন যাত্রার নামকরা অভিনেতা। সেরা বাঙালী পুরস্কার পেয়েছেন ২০১৩ সালে, সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার ২০১৪ তে। থিয়েটারে শিশির ভাদুড়ি, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের পরে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। প্যালেটের জন্যে তাঁর সাক্ষাৎকার আমাদের কাছে পরমপ্রাপ্তি।]

শ্রী শম্ভু মিত্র: এক একলব্যের দূরলভ্য

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

থিয়েটারের তরিকায় পাকাপাকি নাড়া বাঁধার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই শম্ভু মিত্র আমার কাছে ছিলেন এক মরীচিকার মতো উপস্থিতি। শম্ভু মিত্র কে প্রথম দেখি মঞ্চে 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকে। তখন আমার বয়স খুবই কম, সাত কি আট হবে। মা-র সঙ্গে (কোন হলে আজ আর মনে নেই) দেখতে গিয়েছিলাম। প্রযোজনাটির অনেক কিছুই স্মৃতিতে আজ ঝাপসা, শুধু মনে আছে নাটকের প্রায় শুরুতেই মঞ্চের পিছনদিকে দুটি থামের মাঝখানে অয়দিপাউসের আবির্ভাব, সিল্যুয়েটে। দেখে মনে হয়েছিল বুঝি পাথরের মূর্তি। আর মনে আছে তাঁর অসামান্য কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ দক্ষতা, যার ফলে বুঝতে না পারলেও শুনতে পেয়েছিলাম সব কিছু। পরের সাক্ষাৎ শব্দ মাধ্যমে।

তখন আমি আরেকটু বুড়ো, বছর নয় কি দশ হবে। মা একদিন হঠাৎ স্কুল ফেরতা কিনে নিয়ে এনেছিলেন একটি 45 RPM রেকর্ড, গ্রামোফোন ডিস্ক, যার একপিঠে ছিল শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে 'কুড়ি বছর পরে'। রেকর্ডএ আরো অনেকজনের কণ্ঠে আবৃত্তি ছিল; কিন্তু সবাইকে বাদ দিয়ে শিশু কর্ণে বারবার প্রতিধ্বনিত হত শম্ভু মিত্রের উচ্চারণ। শিশুমন তো আর সচেতনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনা, সে বোঝে অচেতনে। বোঝে ঠিকই, শুধু মনে ঠাহর করতে পারেনা। বড় হয়ে সেই স্মৃতির ব্যাখ্যা অচেতন থেকে সচেতন হয়ে ওঠে।

আমার শিশুমন সেদিন বুঝতে পারেনি ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে কুড়ি বছর দূরে থাকার পর আবার তার দেখা পাওয়ার কি তাৎপর্য, সে আবেগের আবর্তন কোন ধরণের হৃদয়-ঝড়। কিন্তু সবটা বুঝতে না পারলেও কিছুটা সে বুঝেছিল। শম্ভু মিত্র তখন তৃষার্ত আবেগ বেগে বলে উঠেছেন, "সোনালি ---! সোনালি চিল! শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে", বালক সেদিন না বুঝেও বুঝেছিল। এমন ছিল সে উচ্চারণের অভিঘাত। এক লহমায় সে বুঝে গিয়েছিল যে জীবনানন্দের জীবনে নিরানন্দ কোনো এক ব্যথা-পাখি বাসা বেঁধেছিল। একলব্য-এর মত সেই বালকটির পথ ছিল নির্জনতার, নিজের সঙ্গে নিজে যুঝে, বুঝে, সুঝে নেওয়ার। বড় হয়েছি যত সম্যক করেছি, শুনতে শিখেছি, অনুকরণ করতে শিখিয়েছি নিজেকে।

ক্রমে ক্রমে বোধের স্ফুরণ এবং উন্মেষ। কবিতা পড়তে শিখেছি। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত সংগীত ও ছন্দ অনুভব, অনুধাবন করতে শিখেছি। তার প্রথম ধাপ ছিল শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি শোনার মধ্যে দিয়ে। ড-য়ে শূন্য 'ড়' কেমন করে বলতে হয়? 'ন' আর 'ণ' -এর কোনো পার্থক্য কি বাংলা উচ্চারণে করা সম্ভব? র-ফলা এবং ঋ-কারের তফাৎ কেমন শোনাবে? শম্ভু মিত্র 'আত্মা' শব্দের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দু বসাচ্ছেন 'ত' -এর ওপর, অথচ সবাই বসান 'আ' -এর মাথায়। এ ভাবেই দূর থেকে অনুকরণের মাধ্যমে, বাংলা বলতে শিখেছিলাম শম্ভু মিত্রের উচ্চারণ শুনে। আমি নিশ্চিত যে ওই প্রজন্মে আমিই একা এরকম একলব্য ছিলাম না। আমার মতো ছিলেন, আছেনও নিশ্চয় আরো অনেকে।

খুব ছোট বয়সে আলাপ ও ঘনিষ্টতা হয়েছিল বাংলা থিয়েটারের আরেক দিকপালের সঙ্গে- শ্রী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার থিয়েটারে হাতেখড়ি ওঁর কাছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে অজিতেশ একবার আমায় বলেছিলেন যে উনি থিয়েটারে আসবেন ও এটাই কর্মব্রত করে বাঁচবেন এই সিদ্ধান্ত নেন 'বহুরূপী'র 'রক্ত করবী' দেখে, শম্ভু মিত্রের অনুপ্রেরণায়। স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, যে ব্যক্তিটি আমার গুরুকে অনুপ্রানিত

করেছিলেন, তিনি কেমনতর? আরো বড় মাপের নিশ্চয়। অজিতেশ আমাকে প্রায়ই বলতেন, "তুমি দুর্ভাগা। শম্ভুদা কেই স্টেজে দেখলে না।" তারপর শম্ভু মিত্রের গল্প বলতেন একের পর এক। মাঝে মাঝে কোনো নাটকের একটি সংলাপ ধরে, কখনো বা উঠে দাঁড়িয়ে, অভিনয় করে দেখিয়ে দিতেন। রেকর্ডে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি বাজিয়ে বুঝিয়ে দিতেন বাংলা উচ্চারণের প্রকারভেদ ও প্রকাশক্ষমতা ঠিক কতখানি। থেমে, থেমে, দেখিয়ে দেখিয়ে। ভুল করলে বারবার শুধরে দিয়ে। প্রয়োজনে মুকুন্দর ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে।বা ধমক দিয়ে, "শোনো মন দিয়ে শোনো। শম্ভু দা এইভাবে বলছেন।" অকৃপণ ও উদার ছিলেন আমার গুরু। আর গুরুর প্রতিভার উদারতায় শিষ্যও পেয়ে যেত দ্রোণাকৃতির অনুপুঙ্খ।

তারপরে হঠাৎ একদিন হাতে চাঁদ পেলাম! 'গ্যালিলিও গ্যালিলেই'। ফ্রিৎস বেনেভিৎস-এর নির্দেশনায় 'বাংলা নাটমঞ্চ' মঞ্চস্থ করলেন বের্টোলেট ব্রেস্টের 'গ্যালিলিওর জীবন'। গ্যালিলিওর ভূমিকায় শ্রী শম্ভু মিত্র। তদ্দিন আমার বয়স বোধহয় আঠারো। তার বেশ কয়েক বছর আগেই থিয়েটার থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন তিনি। কেবল মাত্র এই প্রযোজনাটির জন্য আবার ফিরে এলেন। কোনো কারণে অজিতেশ যেতে পারেননি। তাঁর গেস্ট কার্ডটি, এক মহাপ্রাপ্তি যোগে, জুটে গিয়েছিল এই ভাগ্যবান অধমের। নাটকটা দেখতে গিয়ে আরেক বিপদ। দেখি অদূরেই বসে আছেন শ্রী উৎপল দত্ত, তাঁর পাশেই রামপ্রসাদ বণিক। নাটক চলছে, আর বালক আমি মঞ্চে শম্ভুবাবুকে নজরবন্দি রাখতে রাখতেই দেখে নিচ্ছি দর্শকাসনে উৎপলবাবুর প্রতিক্রিয়া। মাঝে মাঝেই কেমন যেন শিউরে উঠছেন তিনি। (পরে রমাদার মুখে শুনেছিলাম উৎপলবাবু নাকি উত্তেজিত হয়ে বার কয়েক রমাদাকে খিমচেও দিয়েছেন।) আর আমি ভাবছিলাম, আমি যা দেখছি উনিও তাই দেখছেন, কিন্তু এমন প্রতিক্রিয়া কেন? নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম আর ব্যর্থ হচ্ছিলাম। শুধু এইটুকু স্পষ্ট ছিল যে যাঁকে মঞ্চে দেখছি, তার থেকে চোখ ফেরানো সম্ভব নয়। নাটকটি দেখতে যাওয়ার আগে আমার গুরুর নির্দেশে গ্যালিলিও-র ওপর কিছু অধ্যয়ন করে গিয়েছিলাম। সেই অধ্যয়নের ভিত্তিতে ব্রেস্টের নাটকটা কতখানি বোধগম্য হয়েছিল জানিনা, কিন্তু এই টুকু প্রতীতি আলবাৎ হয়েছিল যে মঞ্চে যে গ্যালিলিও কে দেখছি, ঐতিহাসিক গ্যালিলিও তার থেকে বোধহয় খুব অভিন্ন ছিলেন না। বুঝতে পেরেছিলাম গ্যালিলিও-র আকারেরই আরেক আবিষ্কর্তা সেদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অনেক দিন পরে রমাদা গল্প করতে করতে বলেছিলেন, উৎপল দত্ত কেন সেদিন শিউরে শিউরে উঠছিলেন। নাটকটিতে একটি দৃশ্য ছিল যেখানে inquisitiও গ্যালিলিও-কে জিজ্ঞেস করে যে সে ক্ষমা চাইবে কিনা, এবং কবে। গ্যালিলিও তখন আমতা আমতা করে কয়েকদিনের সময় চাইলেন তাদের কাছে। এই সময় চাইবার মুহূর্তের অভিনয় দেখে শিউড়ে উঠেছিলেন উৎপলবাবু আর খিমচে ধরেছিলেন রমাদার হাত।

রমাদাও তো তখন ছোট, বোঝেন নি কেন। পরে জিজ্ঞেস করতে উৎপলবাবু বলেছিলেন, "খেয়াল করিসনি। আমতা আমতা করতে করতে লোকটা আঙুলের গাঁট গুনছিল। সময় নিচ্ছিল।"

"কেন?"

"কেন? মাসের হিসেব করছিল। কোন মাস জোড়, কোন মাস বেজোড়। যাতে জেলে যাওয়ার আগে আকাশের তারা যা দেখার দেখে নিতে পারে। detail, detail!"

রমাদা তখন বলেছিলেন, "তাতে কি লাভ হলো? কেউ তো কিছু বুঝলোই না।"

"আমি তো বুঝলাম! একজন বুঝলেও তো বুঝবে? একজন great actor কখন majority-র কথা ভেবে অভিনয় করেননা। দর্শককে insult করেননা।"

এতদিন শুধু তার আবৃত্তি শুনেছিলাম। একটু একটু করে বুঝতে পারছিলাম বাংলা ভাষার উচ্চারণে কতটা নাট্য সম্ভাবনা, কতটা সঙ্গীত বীজ নিহিত থাকে। শিখছিলাম সুঠাম উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষার গরবে গরবী হতে কেমন

লাগে। কেমন করে ফুটিয়ে তুলতে হয় কাব্য শব্দের দ্যতক অর্থময়তা। কিন্তু সেদিন 'গ্যালিলিওর জীবন' দেখতে গিয়ে জেনেছিলাম সুঠাম উচ্চারণ-ক্ষম অভিনেতার শরীরের উচ্চারণ, শরীরের ব্যবহার কেমন হতে পারে। অবচেতন স্মৃতির আড়াল সরিয়ে আজ সচেতনভাবে বুঝতে পারি সেদিন ঠিক কি দেখেছিলাম। বাহুলয়বর্জিত, নির্ভুল গণিতের মতো সাজানো শারীরিকতা কাকে বলে। কোথাও এক ফোঁটা মেদ নেই।

মাঝবয়সী গ্যালিলিও, নাটকের বিধৃত সময়কালে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হচ্ছেন। তাঁর শরীর ন্যুব্জ থেকে ন্যুব্জতর হচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন আর মনন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠছে ধীমান, খাড়া। এই দুই বিপরীত গতিধারাকে, আপাত বিরোধী বিবর্তনকে, ক্যালেন্ডার-চ্যুত করে মঞ্চে টেনে এনেছেন শম্ভুবাবু। গোটা চরিত্র-চিত্রণটি যেন এক সিম্ফোনি অর্কেস্ট্রার মতো। বিভিন্ন মুভমেন্টের ভ্যারিয়েশনে, নিটোল তারে বাঁধা। ঠিক যেন একটি গ্রাফ রেখার ক্রমিক উত্থান, তারই।মধ্যে ছোট ছোট ওঠানামা, উতোরচাপান, কখনো বা সমতলে চড়ুইভাতি। পরিশেষে ভিন্নরকম এক উত্থানের মতো বিজিতের পতন। সসামঞ্জস, যথাযথ ও ক্রটিহীন নির্মিতি।শ্রী শম্ভু মিত্রের অনহীনয় দেখে সেদিন বুঝেছিলাম কেন ও কিভাবে তিনি অজিতেশকে অনুপ্রাণিত করেছেন। একলব্য ছিলেন অজিতেশও, তাঁরও দ্রোণাচার্য ছিলেন শ্রী শম্ভু মিত্র।

আরো কয়েক বছর বাদে তাঁকে আরেকবার মঞ্চে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, যখন সমাজসেবার উদ্যোগে 'চেনামুখ' নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেছিলেন 'চার অধ্যায়'। বহুদিন পর এক মঞ্চে তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে আবার দেখা গেল সম্ভব মিত্রকে। তাঁর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু অভিনয় করছেন যুবক অতীনের ভূমিকায়। মেক আপ দিয়ে খুব জেঃ বয়স ঢাকার চেষ্টা করেছেন, তা না। কিন্তু আচরণে, চলনে, ঘোরা-ফেরায়, অঙ্গ সঞ্চালনে, কণ্ঠস্বরের দৃপ্ততায়, উচ্চারণের গঠনে, এমনকি নীরবতা ও স্থিরতার ব্যবহারেও কি আশ্চর্য এক উদ্দাম, দৃঢ় যৌবনের প্রকাশ। অথচ সেই উদ্দামতায় নেই কোনো বিশৃঙ্খল উন্মাদনার বেহিসেব। আবার সেই মেদহীন যথার্থ। কি অনায়াস নিয়ন্ত্রণ।

Once you have finished your (theatre) work, it should have a quality of ease. This ease should bring to mind effort; it is effort overcome or victorious effort. (.....) Because only the ease that arises out of effort is of any value. (.....) You know...mastery means having learned how to learn. (Bertolt Brecht, _Brecht on Performance_, from _Messingkauf_, page 111)

সেই অর্থে শম্ভু মিত্র ছিলেন ব্রেশ্ট-এর সেই 'মাস্টার এক্টার', স্তানিস্লাভস্কির টর্টসভ। জিনজ পরিশ্রমকে, চর্চাকে মঞ্চে ব্যক্ত করতে পারতেন অনায়াসরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে। অথচ জলের মতো এমন সহজ হওয়া যে সহজ নয়, একজন ছাত্র-অভিনেতার কাছে তাও সমান প্রতীয়মান। শম্ভু মিত্রের নিজের ভাষায় বলতে গেলে

(A)cting should attune itself to express naturallybthe poetry of passions-the language of poetry. It cannot ve accomplished through a naturalistic style alone. We must find a way to pass easily from the naturalistic plane to the subjective. Exterior nd interior life should rub shoulders with each other and remain organically related. (Sambhu Mitra, _Building from Tagore, trans. Samik Banerjee, Drama review 15.3, 1972, page 204)

অর্থাৎ আবেগকে বাঁধতে হবে প্রশিক্ষিত মুন্সিয়ানার অনুশীলনে। দৃষ্টি আর নির্মাণ একে অপরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কারোর চেয়ে খাটো বা দড় নয়। এই দুইয়ের সন্ধিস্থলের তীক্ষ্ণ আলম্বে নিয়ে আসতে হবে অভিনয়কে, তাহলেই তা হয়ে উঠবে সত্যিকারের 'অভিনয়'। নচেৎ নহে।

'চার অধ্যায়' যখন মঞ্চস্থ হয়েছিল, তখন শম্ভু বাবুর চোখের অবস্থা খুবই খারাপ, প্রায় অন্ধই বলা চলে। অথচ অতীনের প্রচুর হাঁটা চলা, নড়াচড়া রয়েছে। চোখে না দেখতে পেলে এতসব তিনি করবেন কি করে? তখন আমি 'চেনামুখ'-এর সাথে অল্পস্বল্প জড়িত হয়েছি। রমাদার সঙ্গে কাজ শুরু করেছি একটু-আধটু। ভেতরের খবর কিছুটা ফাঁস করে জানিয়ে দিলেন, "জেঠু তো আগে থেকে সব মেপে নেন, পা গুনে গুনে, এঙ্গেল বুঝে, কোথায় ওঠা, কোথায় বসা, সব...পার্ট মুখস্থ করার মতো করে। " সেদিন নাটক দেখে বেরিয়ে রবীন্দ্রসদনের পিছনের দরজার কাছে ঘুরঘুর করছি। তীব্র আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি মহাগুরুকে একবার কাছ থেকে দেখবো বলে। ট্যাক্সি এসে অপেক্ষা করছে। এক কোণে দেখছি আলো-আঁধারিতে উত্তপ্ত আলোচনা করছেন বাপ-বেটার জুটি, তাপস সেন ও জয় সেন। তাপসবাবু রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলছেন, "তুই ফুটলাইট গুলো আগে থেকে নিসনি কেন?" জয় সেন প্রায় প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ নিয়ে বলছেন, "টেস্ট করেছিলাম তো! ইন্টারভালের সময় কেটে গেছে। কি করে বুঝবো? তুমি চিন্তা করোনা, চারটে আলোর মধ্যে একটা জ্বলেনি। ওই চোখ নিয়ে জেঠু নিশ্চই দেখতে পাননি।" তাপসবাবু গজগজ করতে করতে আরো একটু দূরে সরে গেলেন।

যেন লুকোবেন বলে। কিছুক্ষন পর শম্ভু বাবু ধীর কদমে বেরিয়ে এলেন, রমাদার হাত ধরে, গিয়ে উঠলেন ট্যাক্সিতে। পরের দিনের জন্য কিছু নির্দেশ দিয়ে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করলেন। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিলো। গাড়ি চলতে শুরু করলো, আর সেই ভরসাতেই যেন তাপসবাবু অন্ধকারের আড়াল ছেড়ে চুপি চুপি বেরিয়ে আসতে লাগলেন। হঠাৎ গোড়ানো ট্যাক্সি ক্যাচ করে দাঁড়িয়ে গেল। শম্ভু বাবুর মাথা বেরিয়ে এলো জানলা দিয়ে। হালকা স্বরে ডাক শোনা গেল, "তাপস....।" প্রায় পিলে চমকানো অপরাধীর মতো তাপস সেন "হ্যাঁ দাদা" বলে ছুটে এলেন। ভীষণ নরম ও মসৃণ গলায় বললেন, " সামনের ওই চারটে ফুটলাইটের একটি কি আজ জ্বলেনি?" "হ্যাঁ মানে, না মানে..."

"আসলে গালের ডানদিকে আজ উত্তাপটা একটু কম পেলুম মনে হলো, তাই ভাবছি.."।

তাপসবাবু হাতড়ে হাতড়ে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলেন, "ও..."

"জয়কে বলো কাল যেন ওটা আগেভাগে চেক করে রাখে, কেমন?"

মাথা অদৃশ্য হলো জানলার ভিতরে। ট্যাক্সি চলে গেল। তাপসজেঠু হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন "হাঁ করে কি দেখছিস? বাড়ি যা।"

দূর থেকে কোনো মহান শিল্পীকে পর্যবেক্ষণ করতে পারার একটা মারাত্মক সুবিধে আছে। দৈনন্দিন যাপনের বাইরে যে শিল্পী মানুষটি থাকেন, তিনিই প্রধান হয়ে ধরা দেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি কেমন, কার সঙ্গে কি করেছেন বা করেননি, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর কি করা উচিত ছিল, কি করা উচিত হয়নি-এ সমস্ত গৌণ হয়ে পড়ে। অনুপস্থিত আচার্যের প্রস্তর মুর্তিটি ই হয়ে ওঠে জীবন্ত। এক অনুপস্থিত উপস্থিতি। আমার ভেতরকার নাট্য চেতনার বড় হয়ে ওঠার ঠিক সেই মাহেন্দ্র সময়ে-কিশোর যখন বাল্য-এর চৌকাঠ পেরিয়ে সবে সাবালক হতে শিখেছে, যখন সে স্পঞ্জের মতো শুষে নিতে পারে সব-পরম ভাগ্যগুনে একলব্য-এর মত পেয়েছিলাম আচার্য শম্ভু মিত্রকে। ওর অসাধারণ ভাষা উচ্চারণ ক্ষমতাগুনে জেনেছিলাম শব্দের ভিতরে প্রাণ থাকে, ভাষার ভিতরে গান। তাঁর অভিনয়ের যতটুকু ধারণকৃত অডিওতে শুনেছি, তাতেই জেনেছি বিমূর্ত শব্দ কিভাবে শরীরের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে। অর্থময় উচ্চারণ ও ধ্বনিনিক্ষেপনের তারতম্যে কি ভাবে তা হয়ে উঠতে পারে বিমূর্ত-এর প্রতিরূপ, শ্রোতার

কর্ণের ভিতর দিয়া তার মরমে পশিয়া। আর তাঁর মঞ্চাভিনয় যতটুকু চাক্ষুস্মান করার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার ভেতর দিয়ে বুঝতে শিখেছি , কণ্ঠের 'দুই' আর শরীরের 'দুই' যোগ করে কেমন সহজে সামগ্রিক অভিনয়ের 'পাঁচ' হয়ে যায়। অভিনয় হয়ে ওঠে মহান শিল্প।

একজন মহান অভিনেতা কে চিনবো কেমন করে? খারাপ অভিনয় আর ভালো অভিনয়ের তফাৎ-সংজ্ঞাটা কি হবে? একজন দক্ষ অভিনেতা চরিত্র চিত্রায়ন করতে গিয়ে কতটুকু প্রকাশ করবেন আর কতটা গোপন রাখবেন শান্ত আগ্নেয়গিরির ভিতরের লাভার মতো? 'ভালো একটিং' বলতে তিনি কি বোঝেন বোঝাতে গিয়ে, নিজেকে দর্শকাসনে বসিয়ে বলেছিলেন,

"প্রথমত, গলার আওয়াজ বুঝতে পারা যায়। অন্য সকলের চেয়ে গলার আওয়াজ আলাদা হয়...বড় এক্টরের। (.....) যে কোনো ভালো অভিনেতার গলাতে কি একটা থাকে ... রিল্যাক্সশনই হোক বা যাই হোক না কেন, যাতে মনে হয় ওর পুরো সত্তাটা কেমন করে যেন ওই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। (অন্য অভিনেতারা যখন প্রকাশ করতে চাইছে) রাগ হয়েছে, এই রাগটাই প্রকাশ করতে চাচ্ছে। যখন ভালো এক্টর এক্টিঙ করে, তখন কিন্তু ও (যে) রাগটা প্রকাশ করছে, ওটা মুখ্য নয়, ওইটা তখনকার দরকারে বেরোচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে আরো এত জিনিস বেরিয়ে আসে...ভেতরে ভেতরে...যে তখন সেটা খুব --- মনে হয় এইটাই তো ----মানুষটাই তো একটা গপ্পো। (শম্ভু মিত্র, এক বক্তার বৈঠক, সংগ্রাহক শঙ্খ ঘোষ, তালপাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪৯)

এ যেন তাঁর নিজের বর্ণনা দিলেন তিনি নিজেই। অভিনেতার কণ্ঠের ওর শরীরের মিলিত প্রয়াসকে হতে হবে তাদের সামগ্রিক যোগফলেরও অধিক। কথন-অকথন-অবকথন মিলিয়ে সংলাপ হয়ে উঠবে কাহন। প্রশিক্ষণে চর্চিত, নির্মিত শরীরের দেহোত্তীর্ণ উপস্থিতি অভিনয়কে দেবে ব্যাপ্ত আখ্যানের দ্যোতনা, মহাকাব্যের দিক নির্দেশ। ভরত মুনির মতে অভিনয়ের প্রকাশ মাধ্যম চার ভাগে বিভক্ত: বাচিক, আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। প্রথম তিনটি অনুশীলন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করা যায়, কিন্তু চতুর্থটি সাধনার বিষয় । আর সব অভিনেতা কেবলই অভিনেতা, কিন্তু সাত্ত্বিক অভিনেতাই প্রকৃত শিল্পী ও সত্তা। এই সাত্ত্বিক পথেরই সাধক ছিলেন শ্রী শম্ভু মিত্র। আজও যিনি অনুপস্থিতিতেও উপস্থিত।

[লেখক পরিচিতি - প্রখ্যাত নাট্যকার সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় নাট্যজীবন শুরু করেন কৈশোরে। তারপর নানা আদর্শের হাত ধরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্বল করে তার কর্মতরী চির-প্রবহমান। বর্তমানে কোলকাতার বুকে 'স্পেক্ট্যাক্টরস' নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার রূপে তিনি আজও নাট্যচর্চায় মগ্ন। ওনার গান, নাটক, লেখা, চিত্রনাট্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। ওনার কলমে ওনার অভিজ্ঞতার এক টুকরো।]

কান্নাড়া মঞ্চ ও বঙ্গরঙ্গ

রঞ্জন ঘোষাল

আমরা যে শহরটিতে থাকি, ব্যাঙ্গালোর, সেখানে রঙ্গশংকরা নামে ইদানিং একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছে। নাটক শুরু আগে তৃতীয় ঘন্টাটি বাজতেই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে যে চেনা চেনা কন্ঠস্বরটি শোনা যায়, সবাইকে তাঁদের মোবাইল ফোন নীরব করে রাখতে অনুরোধ জানিয়ে, ওটি গিরীশবাবুর।

গিরীশ কারনাড। কর্ণাটকের, তথা গোটা দেশেরই বোধহয় সফলতম জীবিত নাট্য-ব্যক্তিত্ব। সফলতম কথাটি শ্রবণমাত্রে অনেকে ঈষৎ ভ্রূ- উত্তোলিত করলেন দেখতে পাচ্ছি। কেননা, বাদল সরকার এখনো বেঁচে আছেন।** শুধু উনিই নন, একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্য-নির্দেশক এমন তো অনেকেই আছেন, ব্রাত্য বসু, সুমন মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, ঊষা গাঙ্গুলি, মহেশ দত্তানি, সতীশ আলেকর, রতন থিয়াম গুণে যান না।

বুঝতে পারছি আপনারা সফলতম কথাটির অর্থ এখনও হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন নি। গিরীশবাবু এঁদের মধ্যে সফলতম। তার কারণ একাধিক।

প্রথমত, নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতির বিস্তৃতির প্রধাণ কারণ, আমার মতে, কান্নাডা ভাষায় প্রথম মঞ্চস্থ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লেখকের স্বকলমে তার ইংরিজী অনুবাদ প্রকাশ করে ফেলা। অর্থাৎ ভাষা নির্বিশেষে সকলের কাছে টেক্সটা পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রাতারাতি অনূদিত হয়ে বাংলা, হিন্দি কিম্বা মণিপুরী ভাষায় মঞ্চায়িত হয়ে যেতে পারছে।

দ্বিতীয়ত, এবং এটুকু সবাই জানেন, যে এঁর লেখা প্রায় প্রতিটি নাটকই সম্পূর্ণ দেশজ মেটরিয়ালে তৈরি। ভারতীয় কিংবদন্তী কিংবা ইতিহাস আশ্রিত, সংস্কৃত নাটকের আদলে নির্মিত, (যথা, যযাতি, তুঘলক, হয়বদন বা নাগ-মন্ডল) ও তাদের টেক্সট যথেষ্ট উঁচু মানের।

তৃতীয়ত, যদিও অভিনয় বা নির্দেশনায় গিরীশবাবু কোন নতুন দিগন্ত নির্মাণ করে চলেছেন এ কথা জোর গলায় বলা যায় না, তবু, তিনি বহুভাষী, পন্ডিত ও সুবক্তা। জাতীয় সঙ্গীত- নাটক একাডেমির চেয়ারম্যান, লন্ডনের নেহেরু সেন্টারের ডিরেক্টর ইত্যাদি নানা পদ ইনি অলঙ্কৃত করেছেন, সুতরাং নাটকের প্রবক্তা হিসেবে ও কান্নাডা তথা ভারতীয় নাটকের ধারক ও বাহক, তথা আইকন হিসেবে তিনি চিহ্নিত হবেন এতে আর আশ্চর্য কি?
কান্নাডা নাট্যনির্দেশকদের মধ্যে আছেন শিবরাম কারান্থ, বি ভি কারান্থ, এম এস সত্যু, প্রসন্ন পি, লঙ্কেশ, কে ভি সুববান্না, চন্দ্রশেখর কান্তারের মতো বিরল কিছু ব্যক্তিত্ব। এরা শিল্প- সংস্কৃতির সরকারী নানা উল্লেখযোগ্য জায়গায় অধিষ্ঠিত আছেন বা হয়েছেন। এঁরা কান্নাড়া নাটককে দিতে পেরেছেন দুর্লভ কিছু একসপোজার। এঁদের সম্পর্কে দু-চারটি কথা না বললে কান্নাড়া স্টেজ- এর বিষয়ে কিছুই বলা হবে না।

শিবরাম কারান্থ ছিলেন একাধারে প্রোলিফিক লেখক, বুদ্ধিজীবী, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ও যক্ষগান নট। প্রাচীন লোকনাটকের এই ধারাটিকে উনি শুধু বহন করেন নি, এই স্রোতধারাটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, এ যেন আমাদের রায়বেঁশে নৃত্যকল্পটিকে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার মতো দুঃসাধ্য একটি ব্রত। শিবরামের কাছে কান্নাড়াভাষী জনগণ চিরদিন এর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। ৯৫ বছর বয়সে, ১৯৯৭ সালে উনি লোকান্তরিত হন।

পি লঙ্কেশ ছিলেন নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক। খুব ভালো ভালো কাজ আছে এঁর। ইনিও নেই। প্রসন্ন এখন নিনাসমের হাল ধরেছেন, একসময়ে দিল্লির এন এস ডি তে ছিলেন। এম এস সত্যু এখনও কাজ করে যাচ্ছেন। সিনেমা এবং নাটক নিয়ে। কান্নাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য চন্দ্রশেখর কাম্তার নাটক লিখে চলেছেন। সুববান্নার কথা আরেকদিন হবে। উনি কান্নাড়া নাটকের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়। তাঁর কাজ নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে।

২০০২ সালে প্রয়াণ হয়েছে আর একজন কারান্থের, বি ভি কারান্থ। তিনি নাট্য জগতে ছিলেন একাই একশো। নাট্য নির্দেশক, নাট্যকার, নাট্যসঙ্গীত- পরিচালনা, সবকিছু সব্যসাচীর মতো করে গেছেন। দিল্লির ন্যাশানাল স্কুল অফ ড্রামা এবং ভোপালের ভারত-ভবনের কর্ণধার হিসেবেও বহু বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন।
কান্নাড়া নাটকের প্রভূত উপকার এবং বিপদ ডেকে আনার জন্য আমি এঁকে দায়ী করবো।
তার আগে বিপদের গোড়ার কথাটা বলি।

গত তিরিশ বছর ধরে কর্ণাটকের নাট্য-চর্চার অবজার্ভার হিসেবে লক্ষ্য করেছি মূল স্রোতের কান্নাড়া নাটক ।
তিরিশ বছর কম কথা নয়। আগে এদের শতকরা ৯৯ ভাগ নাটক ছিলো সূত্রধার, বৃন্দবাদন ও গায়ন-নির্ভর প্রযোজনা, এখন পালে নতুন হাওয়া লেগেছে। বডি থিটার ও কন্টেম্পোরারি কোরিওগ্রাফি এখন সর্বভারতীয় সমকালীন নাট্যচর্চার অঙ্গ। কর্ণাটকও সেই হাওয়া-মোরগটিকে কাজে লাগিয়েছে। অর্থাৎ ফোক ট্রাডিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব-নাটক।

এখানে আমাদের কলকাতার কিছু নাট্যব্যক্তিত্ব মাঝেমাঝে নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবার। ১৯৭৮ সালে এখানে বাদল সরকার এসে প্রযোজনা করে গেছেন ভোমা, মিছিল আর গণ্ডী। এখানে রঙ্গশঙ্কর উৎসবে নান্দীকার এসে অভিনয় করে গেছেন। জাতীয়-সঙ্গীত নাটক উৎসবে এসে গেছেন বিভাসবাবুরা। ব্যঙ্গলোরের বাংলা নাট্যগোষ্ঠী, মুখোশের কল্যাণে গতবছর আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে সুন্দরমের আর সায়কের প্রযোজনা দেখবার। চেতনাও ঘুরে গেছে বার দুয়েক।

কারান্থ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর আঙ্গিক কান্নাড়া নাটকের স্মৃতি-সত্তা ও ভবিষ্যতের কাছে। সেটা একই সঙ্গে আশা ও আশঙ্কার কারণ। আশঙ্কা এই, যে কান্নাড়া নাটক তার স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে গিয়ে কেবল ঐতিহ্য- আশ্রয়ী হয়ে পড়বে না তো?
আবার আশার কথা, কান্নাড়া মঞ্চ খুঁজে চলেছে তার শিকড়, যেখানে একদিন গড়ে উঠতে পারে নিজস্ব রীতির মহাদ্রুম।

নাটক সম্বন্ধে বাংলা নাট্যমঞ্চও প্রতিদিন নতুন করে ভাবে। নতুন করে নাট্যরীতিকে সাজায়। শ্রম, মেধা, সমাজবীক্ষা ও মননের মধু ঢেলে নাটকের নির্মাণ। বাংলা নাটকের ভালো-মন্দ নিয়ে আজকের আলোচনা নয়।
যাক শ্রমব্যয়। হোক অর্থক্ষয়। আগামী দিনের নাটক নিয়ে ভাববে, কোন দিকে যাবে, এ নিয়ে কান্নাড়া ও বাংলা নাট্যমঞ্চের একটা সামনাসামনি বিতর্কে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আছে।
** এটি ২০১১ সালের আগের লেখা, ২০১১ সালে বাদলদা আমাদের ছেড়ে গেছেন।
[রঞ্জন ঘোষাল – বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং মহীনের ঘোড়াগুলির অন্যতম ঘোড়া। নাটক পরিচালনায় তাঁর জুড়ি ব্যাঙালোর শহরে কেউ নেই। মূলত ইংরেজি নাটক পরিচালনা করেন ও লেখেন। এছাড়া ভাষাবিজ্ঞানে উৎসাহী।' ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশনঃ জার্নি উইথ টেগোর' নাটকটি তাঁকে সারা বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছে।]

বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও রামতারণ সান্যাল

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও তার সঙ্গীতধারা চিরকাল যে গুটিকয় মানুষের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে তার মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রীরামতারণ সান্যাল মহাশয়। আজ তাঁর কথাই আলোচনা করব। ১৮৫৮ সালে বাংলা দেশের খানাকুলা গ্রামে জন্ম হয়ে রামতারণ সান্যালের। খানাকুলা গ্রামটি ফরিদপুরের অন্তর্গত। তাঁর বাবা ছিলেন সে যুগের নামকরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী বৈকুণ্ঠতারণ সান্যাল। এই পরিবার লেখাপড়া ও সাধক পরিবার হিসেব বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল। বৈকুণ্ঠতারণের উত্তর কলকাতার কম্বুলিটোলা, বা, কলুটোলায় ৭ নম্বর রামচন্দ্র মৈত্র লেনে একটি বাড়ি ছিল। সেখানে তাঁর মেয়ে যাদুমণী থাকতেন। ছোট থেকেই রামতারণের খুব সুরেলা গলা ছিল, এবং কারও কাছে না শিখেই সহজাত প্রবৃত্তিতে গান গেয়ে ও বেহালা বাজিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতেন। বড় হবার পর তিনি বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমালেন কলকাতায় কলুটোলার বাড়িতে দিদির কাছে। এখানে থেকেই এফ.এ. পর্যন্ত পড়াশুনো ও পাশ করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি দুটি পছন্দের কাজ শুরু করে দিলেন। এক সেই সময়কার কলকাতায় বিখ্যাত বেহালা বাদক ছিলেন নুলো গোপাল – এই নুলো গোপালের কাছে প্রথামাফিক বেহালা শিখতে শুরু করলেন, এবং, শ্যামপুকুরের ওস্তাদ কানা যোগেনের কাছে শুরু করলেন গান বাজনা শিক্ষা।

আসুন, একবার দেখে নিই সেই সময় কলকাতায় সঙ্ঘবদ্ধ রুচিশীল সংস্কৃতির কী হালচাল ছিল, বা কী ভাবে তা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। সে সময় উত্তর কলকাতার বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, বেলগাছিয়া, জোড়াসাঁকো এই সব অঞ্চলে অনেক ধনবান মানুষ ছিলেন যাঁরা তথাকথিত বাবুকালচারের প্রতি ততটা আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু এর বাইরে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা বলতে দুর্গাপুজো, কীর্তন, ঢপ কীর্তন, বা কথকতা, এবং পালেপার্বণে বাঈনাচ ও গানবাজনার চর্চা করতেন ও করাতেন। মোদ্দা কথা চাইলেও এর বাইরে আর কিছু করার মত রসদ বা আয়োজন তাঁদের হাতে ছিল না, অথচ সকলেই চাইছিলেন অন্যরকম কোনও কিছু একটা হোক। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চিৎপুরের জমিদার পরিবার। এখনকার যা রবীন্দ্রসরণী, তার ওপরেই ছিল এই জমিদার বাড়ি, আর সেই বাড়িতে ছিল বিশাল এক ঘড়ি। বড় রাস্তা থেকেই দেখা যেত সে ঘড়ি, আর তার নামেই বাড়ির নাম মানুষের মুখে মুখে হয় যায় ঘড়িওয়ালা সান্যাল বাড়ি। এই সান্যাল বাড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল রসরাজ অমৃতলাল বসুর। আর সেই সময় রসরাজের সাথে খুবই হৃদ্যতায় জড়িয়ে ছিলেন রামতারণ সান্যাল নিজেও। রসরাজকে তিনি সেজদা বলে ডাকতেন। রসরাজের উদ্যোগেই চিৎপুরের জমিদার বাড়িতে বাংলার প্রথম পেশাদার রঙ্গালয় – ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপিত হয় ১৯৭১ সালে। এবং এই মঞ্চের উদ্যোগে প্রথম নাটক হয়েছিল ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ সালে 'নীল দর্পণ', যাতে কোনও মহিলা অংশগ্রহণ করেন নি। নাটকের পরিচালনা এবং প্রযোজনা করেছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু, সঙ্গে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, ভুবনমোহন নিয়োগী প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব। জমিদার বাড়ির সামনে বিরাট একটা খোলা মাঠ ছিল, সেই মাঠেই স্টেজ বানিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। অবশ্য ন্যাশানাল থিয়েটার একদিনে হুট করে হয়নি। বাগবাজার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে তখন একটি এ্যামেচার নাটকের দল ছিল, যাদের অভিনীত দীনবন্ধু মিত্রের লিখিত "সধবার একাদশী" তখন খুব জনপ্রিয়ও হয়েছে। এই দলের নাম ছিল 'বাগবাজার এ্যামেচার'। বাগবাজার এ্যামেচারের কুশীলবদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, রসরাজ অমৃলাল বসু প্রভৃতি। পকেটের পয়সায় নাটক করে তো আর বেশি দিন চলতে পারে না, তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বড় মানুষের সহায়তার; নাট্যমঞ্চের যে ছবি আজও অতি কঠোর বাস্তব আমাদের দেশে! এই কারণেই বাগবাজার এ্যামেচার পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্যান্য কারণে

চিৎপুরের জমিদার বাড়ির সাথে যুক্ত হলেন ন্যাশানাল থিয়েটারের পোশাকী নামে রসরাজের উদ্যোগে। যদিও গিরিশ বাবু প্রথম দিন থেকে নিজে খুশি ছিলেন না এই সিদ্ধান্তে।

ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রথম নাটকটি পেশাদার নাট্যমঞ্চের যেমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তেমনি প্রথম দিনেই এই নাটককে ঘিরে একটি ভারি মজার ঘটনা ঘটে। রসরাজ রামতারণকে বলেন যে তারণ, তুমি নাটক শুরুর আগে একটু বেহালা বাজিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে? একটা পরীক্ষা করেই দেখা যাক না, দর্শকদের একটু নতুন চমক দিলে তারা তা কেমন ভাবে নেয়? রামতারণ তো সেজদার কথায় এক পায়ে খাড়া! সন্ধ্যেবেলা একক বাদক হিসেবে বেহালা নিয়ে বাজাতে বসে তিনি ধরলেন ইমন কল্যান! সে বাজনা তাঁর দক্ষতার গুণে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছাল যে নাটকের সময় হয়ে গেলেও দর্শক আর তাঁকে উঠতে দিতে চায় না। তিনিও ইতিমধ্যে বাজনায় এত মগ্ন হয়ে গেছেন, যে কিছুতেই তাঁকেও আর থামান যাচ্ছে না। দু-দিক দিয়েই তখন ঘোর বিপদে উদ্যোক্তারা! শেষে তাঁর গানের গুরু কানা যোগেন বেহালার ছড়ি দিয়ে পিঠে সজোরে আঘাত করে হুঁশ ফিরিয়ে বাজনা থামান। এরপর শুরু হয় নাটক।

আগেই বলেছি গিরিশ বাবু নিজে এই সিদ্ধান্তে খুশি ছিলেন না এবং এই উদ্যোগের বিরোধিতাই করেছিলেন। তিনি মুখের ওপর পরিস্কার বলে দেন যে, ‘‘এই ধরণের অ্যামেচারিস্ প্রোফেশনালিজম্ পছন্দ করছি না...’’। সত্যি বলতে কি, ১৮৭৩ সালে তিনি ন্যাশানাল থিয়েটারের সঙ্গও ত্যাগ করেন, এবং গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করে তাতে যোগ দেন - এই খানেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে মিনোর্ভা। এই গ্রেট ন্যাশানালে গিরিশ বাবু ম্যানেজার হয়ে যান ১৮৮০ সালে। যা হয়, সকলে গিরিশ বাবুকে অনুসরণ করে গ্রেট ন্যাশানালে যোগ দিলেন, ও আবার সেই একই ভাবে নাটক শুরু হলো, তখন কিন্তু গিরিশ বাবু নিজেও বিরোধিতার বদলে এই কাজে প্রচুর সাহায্য করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে পরবর্তীকালে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হবার পরে আগাগোড়া উপদেশ, নির্দেশ দিয়ে তিনি অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে ‘‘আদর্শ সতী’’ নাটকটি লিখতে সাহায্য করেন, এবং সুরকার হিসেবে বেছে নেন রামতারণ বাবুকে। কেবলমাত্র অসাধারণ সুরই নয়, এই নাটকে রামতারণ নাচের কলাকৌশলের নির্দেশনাও করেন। বলে রাখা ভালো সেই সময়ের নাট্যমঞ্চে নাচ ব্যাপারটার কোনও সংগঠিত রূপ বা নির্দেশ ছিল না। যে যেমন করে পারত নিজের নিজের মতন নাচ করা, এবং করানোর চেষ্টা করত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা খেমটা নাচে পরিণত হতো। যদিও হাতে গোনা দুই একজন শিল্পী মঞ্চ নাচের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, যার মধ্যে অবশ্যই তারাসুন্দরী অন্যতম একজন। তা সাধারণ শিল্পীরা যে নাচ করতেন নাটকের প্রয়োজনে, তার কোনও প্রথাগত নিয়ম ছিল না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সব নাচ কিন্তু মানিয়েও যেত। যেমন ‘‘একেই কি বলে সভ্যতা’ নাটকের সভার দৃশ্যে যে নাচ হতো, তা খেমটারই উপযুক্ত। আর হাসির দৃশ্যে তখন নাচের জন্য সকলে এক কথায় গুরু মানতেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি-কে – তাঁর নাচ তিনি নেচে দিতেন, সে জিনিস করার ক্ষমতা আর কারও ছিল না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। সেই সময় রঙ্গমঞ্চ জুড়ে পঞ্চরঙের খুব বাড়াবাড়ি হয়। এই পঞ্চরঙ ছিল আরব্য রজনী কেন্দ্রিক বিশেষ বিষয় নিয়ে রচিত পালা, যাতে প্রচুর পরিমাণে নাচগান থাকত। রামতারণ এই সব পঞ্চরঙের সর্বময় পরিচালক ছিলেন, এবং এই দিয়েই তিনি মঞ্চে নাচের কাজের হাতেখড়িও করেন। যদিও তাঁর সাধক মামার কাছে ছোট বেলায় তিনি ধরে বেঁধে কীর্তনের সাথে কী ভাবে নাচ করতে হয় তার বিশদ তালিম পেয়েছিলেন, যা তাঁকে মঞ্চ নৃত্য পরিচালনায় বিশেষ মাইলেজ দিয়েছিল বইকি।

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার ঠিক করল ‘‘সতী কী কলঙ্কিনী’’ নাটকটি মঞ্চস্থ করবে। এই নাটকে কিন্তু আর যে যার মতন যেমন খুশি নাচো – এই ভাব চলল না! নাটকের পরিবেশ দাবী করেছিল হাব ভাবের সাথে উপযুক্ত নাচ। এই নাটকের রচয়িতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সুরকার মদনমোহন বর্মণ। যদিও একজন আলাদা

নাচের শিক্ষক ছিলেন, তবুও মূলতঃ মদনমোহন এই গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সবাইকে রোল অনুযায়ী নাচের ট্রেণিং দিতে শুরু করেন। রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম ধরে বেঁধে নাচকেও একটা সমান গুরুত্বের সাবজেক্ট হিসেবে দেখা শুরু হলো। মদনমোহনের অব্যাহতির পরে এই দায়িত্ব তুলে নেন রামতারণ সান্যাল, ওই "আদর্শ সতী" নাটক থেকে। এই নাটকের কাজের থেকেই সুর-তাল-নৃত্যের পারদর্শিতায় রামতারণের নাম ছড়িয়ে যায় দর্শকের মুখে মুখে। এই নাটকের ফলে লোকসানে চলতে থাকা গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে বিরাট সাফল্য আসে। সেই সূত্রেই ১৮৭৭ সালের ২ রা মে রামতারণের সম্মানার্থে গিরিশ বাবু একটি বেনিফিট নাইটের আয়োজনও করেন! স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ও নাচের গুণমুগ্ধ ছিলেন এতটাই যে তিনি তাঁর রচিত "মলিনমায়া" নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন রামতারণকে! "আলিবাবা" নাটকে মুস্তফা মুচীর ভূমিকায় রামতারণের নাচ গান ও বিশেষ রং ঢং এর উল্লেখ তিনি আজীবন করে গেছেন, সর্বদা বলতেন যে ওই নাচ 'এখনও আমার স্মৃতিতে আছে'। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচিত "আলিবাবা" নাটকের সুরকার কিন্তু আসলে ছিলেন রামতারণ, যদিও কাগজে কলমে তা দেবকণ্ঠ বাগচীর নামেই প্রসিদ্ধ।

এই যে এত গান বাজনার ঝোঁক, সঙ্গীতময় পুরুষ রামতারণ সান্যাল, তাঁর ছেলে মেয়েরা কেউই কিন্তু গান বাজনার দিকে যান নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন বাদেই মাথায় তাঁর কী খেয়াল চাপে, হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে জাহাজের খালাসীর চাকরি নিয়ে ১৮৯৩-৯৪ সালে বিলেতে চলে যান! সেই যে গেলেন, দীর্ঘ চার বছর কেউ তাঁর কোনও খোঁজ দিতে পারেনি। একদম নিরুদ্দেশ, বা বেখবর বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই! এই সময় বিলেতে সে যুগের বিখ্যাত বেহালা বাদক এল.সি.উইলসনের কাছে তিনি ইউরোপিও ধারায় বেহালার এবং কনসার্টের তালিম নেন। একই সঙ্গে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষাও করতে থাকেন কী ভাবে কী সংমিশ্রণ করলে দেশী ও বিদেশী ধারার সমন্বয়ে আকর্ষণীয় কনসার্ট বাজান যায়। এখান থেকে যান ইতালিতে। ইতালির অপেরা তখন পৃথিবী বিখ্যাত। প্রাণ ভরে তাদের কাজ দেখেন ও শেখেন রামতারণ। সেখান থেকে আসেন চিনে। চিনের রাজাকে বেহালা শুনিয়ে এমন আপ্লুত করেন যে তিনি রামতারণকে ছয়টি সোনার কাপ, ডিশ ও প্লেট উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। চিন থেকে তিনি ফিরে আসেন আবার কলকাতায়। এবার দক্ষিণাচরণ সেনের সাথে জোট বেঁধে 'ব্লু রিবন অর্কেষ্ট্রা পার্টি' তৈরী করেন। এই দক্ষিণাচরণ সেন ছিলেন সে যুগের কলকাতায় এক নম্বর কনসার্ট বাজিয়ে। পুরনো পরিচয় ও গুণের সুবাদে রসরাজ ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা কে ডাকলেন "প্রফুল্ল" নাটকের অভিনয়ে বাজাবার জন্য – বলাই বাহুল্য তাদের সাফল্য ছিল আকাশ ছোঁয়া!

এই সময়, ১৮৯৮ সালে কলকাতায় আসেন জে.জে. স্টিভেনশন ও তাঁর স্ত্রী নেলী মাউণ্টশকল্। এঁরা ম্যাজিক লণ্ঠনের খেলায় পারদর্শী ছিলেন। ততদিনে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। রসরাজ অমৃতলাল বসু, হরিভূষণ বোস, ভূবন নিয়োগী প্রভৃতি মিলে দেখা করলেন এই দম্পতির সঙ্গে। তাঁদের কাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করে নিশ্চিত হয়ে প্রস্তাব দিলেন যে স্টার থিয়েটারের মঞ্চেই তাঁরা তাঁদের কাজ প্রথম প্রদর্শন করুন। প্রথমে নাটক হবে, ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"। এই গীতিনাট্যের পরিচালক রামতারণ বাবু। নাটকের পরে সিনেমা দেখান হবে, এবং সব শেষে নেলীর "ফায়ার ড্যান্স" – যাতে দেখান হবে আগুনে নেলী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এত রকমের উপস্থাপনা এক সঙ্গে, সে এক নতুন হইচই এর কাণ্ড হলো কলকাতা শহরে। চারিদিকে পোস্টার পড়ে গেল, তাতে লেখা ছিল, 'ছবি পর্দায় হাসিবে, নাচিবে, গাহিবে, যাত্রী সমেত রেলগাড়ি ছুটিবে, আসুন। বিলম্বে হতাশ হইবেন...' ইত্যাদি। এই কাজে ভীষণ সাফল্য এলো। চলচ্চিত্রে একবার আগুনের প্রদর্শনীতে যখন দেখান হচ্ছে যে জ্বলন্ত আগুন কী ভাবে নেভায় ফায়ার ব্রিগেড, তখন তার বাস্তবতার ছায়ায় দর্শকেরা ভয় পেয়ে আগুন আগুন বলে ভয় পেয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি শুরু করে দেন! রসরাজ নিজে এসে তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে এটা সত্য ঘটনা নয়, ছবিতে দেখান হচ্ছে মাত্র, আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।

একসঙ্গে কাজ করার সূত্রে একবার রামতারণ বাবু নেলীকে প্রস্তাব দেন যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওপর ভিত্তি করে তিনি যে নাচ করছেন, তার সাথে পিয়ানো ও বেহালার যুগলবন্দীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধারা মিশিয়ে নতুন ধরণের প্রয়োগ যদি মঞ্চে করা যায় তাহলে তা আরও আকর্ষনীয় হতে পারে। নেলী এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। সুরারোপের সময় পাশ্চাত্য ধারায় রামতারণের অসাধারণ সঙ্গতি দখল দেখে নেলী অবাক হয়ে তাঁকে শুধান যে কী করে আপনি পাশ্চাত্যের সুরের গভীরতা এমন ভাবে আয়ত্ব করেছেন? উনি তখন তাঁর গুরু উইলসন সাহেবের কথা বলেন যা শুনে নেলী পর্যন্ত সসম্ভ্রমে রামতারণকে সম্মান দেখান।

রামতারণ সান্যালের লেখা একটি বই ছিল, ‘‘বেহালা শিক্ষা’’, যা এখন আর পাওয়া যায় না। জানি না এ লেখা যাঁরা পড়ছেন, তাঁরা কেউ সে বইয়ের হদিশ দিতে পারবেন কি না, পারলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আগেই বলেছি নুলো গোপালের কাছে প্রথমে বেহালা শিখেছিলেন রামতারণ। এই নুলো গোপালের আর এক বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন, বাবা আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব। সতীর্থ হিসেবে দুজনের মধ্যে হৃদ্যতাও ছিল খুব।

এই প্রসঙ্গে নাটকের বাইরের একটি গল্প বলি। সিমলার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তরকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিখ্যাত, সখ্যতা ছিল খুব। তাঁর সূত্রেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন, ও তাঁর অনুগামী হন। মাস্টার মশাই, শ্রীম, বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথামৃতে বহু জায়গায় তাঁর নামের উল্লেখ আছে। তা এমনই একদিন বিকেলবেলা গঙ্গাপাড় ধরে দুজনে যাচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, দুজনের হাতেই বেহালা। সুরধুনির আওয়াজে থমকে গিয়ে রামতারণ বললেন, বলতো নরেন, গঙ্গা এখন কোন সুরে বইছে? নরেন্দ্রনাথ বললেন, আমার মনে হচ্ছে পুরিয়া, রামতারণ ঘাড় নেড়ে বলেন, নাহ, আমার মতে ইমন। আলোচনা করে ঠিক হলো, যে চলো বেহালায় সুর বাঁধো ও যে যার মতে বাজাও। যার সুর গঙ্গার সাথে মিলবে না, তার তার ছিঁড়ে যাবে। যেই কথা সেই কাজ। অল্প সময়েই দেখা গেল নরেন্দ্রনাথের বেহালার তার গেছে ছিঁড়ে!

গিরিশচন্দ্রের ‘‘বুদ্ধদেব চরিত’’ নাটকের বিখ্যাত গান, ‘জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই’এর সুরকার ছিলেন রামতারণ। একদিন তিনি এই গানটি, এবং ‘কোঁ কোঁ কোঁ বয়রে ঝড়’ এই গান দুটি পরপর গেয়ে শোনান পরমহংস দেবকে। সেই শুনে তিনি বলেছিলেন, ও তারণ এ কী করলি? পায়েসের পর নিমঝোল কি ভালো লাগে?

একবার রসরাজ রামতারণ কে বলেন যে দেখো রামতারণ, তুমি সুর করছো সে দারুণ জিনিস, কিন্তু সদা সর্বদা যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আশ্রয়ে থাকো, তাহলে তা সর্বজনগ্রাহ্য কী করে হয় বলো দেখি? সে কথা শুনে তিনি বলেন যে সেজদা, ঠিক আছে। এবার দেখবেন এমন সুর করব যাতে বিড়িওয়ালা থেকে ভদ্রলোক সকলেই আমার সুরে গুনগুন করবে। সত্যিই তাঁর সুর সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সমান ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। রসরাজের ‘‘খাসদখল’’ নাটকে তিনি শেষ সুর করেন। গিরিশ বাবুর ‘‘বলিদান’’, ‘‘সিরাজদৌল্লা’’, ‘‘চৈতন্যলীলা’’, ‘‘বিল্মমঙ্গল’’, ‘‘প্রফুল্ল’’, ‘‘আবু হোসেন’’ ইত্যাদি নাটক ছিল তাঁর অন্যতম কাজ। এছাড়াও ‘‘আলিবাবা’’, ‘‘মায়াতরু’’, ‘‘হরিশ্চন্দ্র’’, ভারতচন্দ্রের ‘‘বিদ্যাসুন্দর’’, ‘‘অন্নদামঙ্গল’’, ‘‘সীতা হরণ’’ ইত্যাদিও তাঁর বিশেষ কাজ যা মানুষের মনে দাগ কেটেছিল। তাঁর সুরারোপিত ‘‘মায়াতরু’’ ও ‘‘প্রোমোদ কানন’’ এই দুটি গীতিনাট্য তখন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে গানের জন্য। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, প্রোমোদ কাননের রচয়িতা স্বয়ং রামতারণ। ১৮৭৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী ‘‘কামিনীকুঞ্জ’’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। এখানে ইতালিয়ান অপেরার সুরের আদলে সুর দেন রামতারণ। ইংলিসম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এই যে – ‘New opera, New opera – Kamini Kunja, in the style of Italian opera. First time in the stage of India’ - এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাঙালী তথা গোটা ভারতবর্ষ জানতে পেরেছিল যে কলকাতার একজন বাঙালী ইতালিয়ান আঙ্গিকে অপেরাধর্মী একটি গীতিনাট্য উপস্থাপনা করেছেন এদেশে প্রথম।

১৮৮৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজে স্টার থিয়েটারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তা ছিল এইরকম:
Sumptuous Festival of Music Mirth!
Especially to suit the taste of several European Gentlemen who are expected to grace the Theater with their presence on this occasion to enjoy the music of "Kamini Kunja" by Babu Ramtararn Sanyal (Actor and Music Director).

সঙ্গীত পাগল রামতারণের একটি মজার ঘটনা বলি। একবার সাবিত্রী সত্যবানের ঘটনা অবলম্বনে একটি নাটক করা হচ্ছে যেখানে তিনি নিজে মিউজিক ডিরেক্টর এবং সত্যবানের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। দৃশ্যে মৃত অবস্থায় তিনি স্টেজে শুয়ে আছেন, এবং করুণ সুরে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক বাজছে। অসাবধানে হঠাৎ বাজিয়ের হাতে একটি ভুল রিডে পড়ে যায়। ব্যাস! আর যায় কোথায়! তড়াক করে মৃত সত্যবান লাফিয়ে উঠে ছুট সোজা গ্রীণরুমে ওই বাজিয়েকে তিরস্কার করতে। এদিকে হলে হাসির রোল পড়ে গেল, তাঁর কিন্তু কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লেন মৃত সত্যবানের ভূমিকায়! সেই থেকে এই ধরণের কোনও ঘটনা ঘটলে নাট্যমঞ্চে একটা কথা চালু হয়ে যায়, 'বেসুরে বাঁচিল সত্যবান'!

নদীয়ার মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে প্রফুল্ল নাটকটি অভিনীত হয়, ১৮৮৯ সালের ৩রা অগস্ট। মহারাজ নিজে উপস্থিত ছিলেন নাটকটি দেখতে। এই দিনটি আচার্য রামতারণ সান্যালের জীবনের একটি বিশেষ দিন অবশ্যই। নাটকের গান শুনে অভিভূত হয়ে মহারাজ তাঁকে প্রণাম করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন যে, আপনি সরস্বতীর বরপুত্র।

নানান জায়গা ঘুরে ঘুরে গান স্বরলিপি সংগ্রহই শুধুমাত্র না, দেশভক্তিও ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। এই সময় স্বাধীনতা আন্দোলন দানা পাকাতে শুরু করে, যার ঢেউ এসে পড়ে বাংলার নাট্যমঞ্চেও। ফলতঃ ১৮৭৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে ''গজানন্দ ও যুবরাজ'' নামের ব্যাঙ্গাত্মক প্রহসনমূলক নাটক অভিনীত হয়। সুর করেছিলেন রামতারণ। নাটকটি আদতে ছিল বৃটিশ রাজের শাসনের প্রতিবাদী নাটক। এতে একটি গান ছিল, বেলুবাবু গাইতেন, 'ওরে জজ হতে চাও, গজ গিরিকন' – যা ছিল প্রচণ্ড বিদ্রুপাত্মক। গানের কথার ও ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রামতারণ যা সুর করেছিলেন, তা সরকারকে বিচলিত করেছিল। বাংলা থিয়েটারে অন্যতম ভয়ঙ্কর বিদ্রুপাত্মক এই নাটকটি অভিনয়ের চার দিনের মাথায় পুলিশ বন্ধ করিয়ে দেয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দমে না গিয়ে নাম বদলে ''হনুমানচরিত'' নাম দিয়ে আবার তা মঞ্চস্থ করতে শুরু করে। ফলে আবার শুরু হয় পুলিশি জুলুম এবং নিষেধাজ্ঞা। নাটকের ওপর এই জুলুম নাট্যপ্রেমী মানুষ মেনে নিতে পারে না, তারই প্রতিবাদে আর একটি প্রহসনাত্মক নাটক লেখা হয় ''পুলিশ অফ পিস এণ্ড শিপ'' নামে। এবং গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার আবার তা মঞ্চস্থ করে রামতারণের সুর-পরিচালনায়। কর্তৃপক্ষের এই চরম ঔদ্ধত্য কোনও মতেই পুলিশ আর বরদাস্ত করেনি। ফলে রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে সকলের সাথে গ্রেফতার হলেন রামতারণ। এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রন আইন জারি করে সরকার। এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে বেড়ান রামতারণ প্রভৃতিরা। এই অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে, হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে হাজত বাসও করায় এক রাত্রি। সঙ্গে ছিলেন রসরাজ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রভৃতিও। এই যে বিশাল জনপ্রিয়তা, তা কিন্তু রামতারণের সাধারণ সত্তাকে টলাতে পারে নি কোনদিন। সে সময় হাতে লেখা পোস্টার লাগান হতো আঠা দিয়ে। সকলের সাথে সাথে রামতারণ নিজেও যেতেন রাত্রে নাটকের পোস্টার লাগাতে দ্রষ্টব্য স্থানে স্থানে।

একটু খেপাটে গোছের, অত্যন্ত চরিত্রবান রামতারণের দুটি নেশা ছিল। প্রথমটি সঙ্গীত, এবং দ্বিতীয়টি সুগন্ধি আতর ও গোলাপজল। এই শৌখিনতার জন্য পরিচিত সবাই তাঁকে 'রাজাবাবু' বলে ডাকত। এই বিষয়ে ইন্দুবালা দেবীর একটি গল্প বলি। সে সময় মঞ্চে নিয়মিত গান ও অভিনয় করছেন ইন্দুবালা। প্রফুল্ল নাটকের একটি বিশেষ গান, 'মা তোর কোন দেশী বিচার' গানটি অনেকবার দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ঠিক মতন তুলতে না পারায় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রামতারণ বেহালার ছড় দিয়ে কষে দুই ঘা দেন ইন্দুবালাকে। সকলের সামনে সেই মার খেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি গান তোলেন। এবার ঠিকঠাক হয়। খুশি হয়ে রামতারণ সেই দিনই তাঁকে এক শিশি 'ইভনিং ইন প্যারিস' সুগন্ধি উপহার দিয়েছিলেন। আমৃত্যু সেই সুগন্ধি ইন্দুবালা অতি যত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বলতেন এটি তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা সম্মান।

শুধু গানেই নয়, অভিনয়েও তিনি সমান ভাবে ডুবে যেতেন। একবার "শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নাটকের সময় কর্তৃপক্ষ দেখল, সর ননী ব্যবহার করলে অযথা খরচ বাড়ে, তার চাইতে চুন দিয়ে দাও ভাঁড়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে সর ননী। তাই করা হলো। ওদিকে অভিনয়ে মশগুল রামতারণ খেয়াল না করে সেই চুনের ডেলা মুখেও দিয়ে দিয়েছেন। মুখে পুড়ে যন্ত্রণাকাতর রামতারণ অস্থির। ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে ফলস্ জিনিস দেওয়া হয়েছে? ইয়ার্কি পেয়েছ তোমরা?

সে যুগের থিয়েটারে গ্রাণ্ড অপেরা এবং কমিক অপেরা এই দু-ধরণের নাট্যগীতি সাফল্যের সাথে প্রচলন করেন রামতারণ সান্যাল। এ হলো তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। অপরের দুঃখে কাতর রামতারণ ছিলেন এক মহৎ হৃদয় মানুষ। ১৯০৩ সালে ফরিদপুরে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময় তিনি উদ্যোগ নিয়ে রসরাজের সাহায্যে কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা তুলে দুর্গতদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তুলনায় খুব কম বয়সে রামতারণের মৃত্যু হয়। সদাসর্বদা তাঁর একনিষ্ঠ কাজের লোক বেণী সাথে সাথে থাকত। স্টার থিয়েটারে অভিনয় শেষ করে ভোর রাত্রে জুড়িগাড়ি নিয়ে তিনি সোজা চলে যেতেন কাশী মিত্রের ঘাটে। সেখানে সারারাত ধরে যাত্রা নাটক হতো। ভোরে গঙ্গা স্নান সেরে শ্মশানেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপর বাড়ি ফিরতেন। পোষাক আসাক, পুজোর উপাচার, আর আর প্রয়োজনীয় সব কিছুর যোগাড় করে রাখত বেণী। অধ্যাত্মবাদী সাধক পরিবারের সন্তান রামতারণ এই কাশীমিত্রের ঘাটের কাছেই তাঁর অন্তর্জলি যাত্রা করেছিলেন। এখানেই ১৯১২ সালের কোজাগরী পূর্ণিমাতে রাত্রেই এগারটায় মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সূত্র:

- গিরিশ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৫, পৃ: ৩৩৫
- স্মৃতিকথন – অমিয়নাথ সান্যাল
- সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, কলিকাতা, ১৩৩৩, বৈশাখ
- অতীতের সুরে (দ্বিতীয় খণ্ড) – ডঃ গীতা সেন, এম.সি.সরকার এণ্ড সনস্

চেন্নাই # ২০/১১/২০১৭

[সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়—শ্রী চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন থেকে রসায়ন নিয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি করেছেন এবং এখনও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার কাজে নিযুক্ত। কিন্তু এসব তাঁর কাছে নেহাৎই দিনগত পাপক্ষয়। আরও অজস্র বিষয় নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তিনি। মুখ্যত হারিয়ে যাওয়া পুরোনো বাংলা গানের ও তার ইতিহাসের গবেষণা তার চর্চার বিষয়। এ বিষয়ে তার বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজে সুগায়ক এবং পুরাতনী, টপ্পা ও সেকালের নানান বিষয়ের গানের তামিল প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। এহেন গুণী মানুষ শ্রী সোমনাথের সমর্থণ SEPAI এর আমরা ধন্য।]

The Year that was

Mitankar Das Sarkar

Palette is already one year old. And what a lovely year it has been. The year was packed with excitement, colours, and performing arts. it started with the second chapter of SEPAI theatre festival, Ranga Mohana, 2017-18. Ranga Mohana was conceived and implemented in the year 2015 on a grand scale. This year, it was bigger in stature and more grand in content. Artists from across the country flooded in to celebrate art in varied forms. There was children's play, street plays, western music, mono-acts, short plays by college students, dance recitals, proscenium theatre by stalwarts and what not.

This year Ranga Mohana 2016-17 was spanned across the city at three different locations: Rangasthala, MGRoad; Shoonya, Lalbagh; Guru Nanak Bhavan. The fest took place on three different dates. People flooded in to make the shows a grand success.

On November 19, Day 1 of tbe festival, the energy was infectious. Team had reached the venue, bustling with high enthusiasm. There was music, food and celebration. It opened with a children's play, Poddomoni presented by Crossroads Serenaders. This play was adapted from Nabanuta Debsen's novel. The children were unabashed in their expressions and portrayed the characters to the tee. This was followed by Udaan, a street play presented by the school.goers of The Samhita Academy. The students spoke of such grave concerning issues in such an effective way. Hats off.

On the same day, we got to see how silence can create magic and speak.volumes in the Mime show put up by Mounokala. The evening progressed with a ballad of old western hits presented by Tanusree. The groove of the vintage style of the music. Audience was swaying to the beats. Some even joined in to.known tunes. The evening entered on a note more traditional. Shubham, a school of performing arts presented their dance recital, Uttoron. The depiction of association of an artist with the art; a sculptor with his sculpture through the classical dance form was a treat as a finale for the evening.

The next day was equally buzzing with frenzied energy. It started with a lecture demonstration on how one may appreciate art in any form. Amitava Baksy, the creative mind behind successful shows and the artistic director of ENAD, emphasised on the point that art is to generate emotions within and in audience, artificially. He spoke of different parts of the brain and how they work in tandem to create the ability to perform art. The session was interactive.

It was followed by ENAD's in house production, Michhil, a play by Badol Sarkar. The play was presented in the third theatre format. The play was relevant in today's times and posed a lot of valid questions.

This was trailed by a dramatised story telling in Hindi: a collaborative performance by StageCraft and RangManch: it was a montage of stories by Parsai: 2 stories Sudama ka Chawal and Asahamat by famous Hindi writer and one of the best Satirist in Indian Literature Harishankar Parsai. The energy and projection of the same by the students was amazing. The audience was glued to their seats till the end. It was a grand way to close for the day.

It was almost a month after the first stream. But there was hardly any drop in the energy. It would be apt to say that the team was more energized and ready for the second stream.

It started with a mono-act in English. Wife's Letter was adapted from Tagore's short story "Streer Potro". It was set up in the medieval era where emancipation of women was not profound. It dealt with the emotional turmoil a housewife went through. Her expression was only through the letters that she wrote. Directed by Amitava Baksy, it was a performance that had stirred the audience.

In line, we had a pantomime by Ekalavya. "The Lost childhood", as the name suggested, depicted how children in modern times were getting deprived of the fun and excitement of their childhood. It also showcased how and where we, as parents, might be lacking in. Could we do an extra bit to bring the dream childhood back in our kids life? Ekalavya delivered a performance to remember.

We had dramatised story telling in Hindi: a collaborative performance by StageCraft and RangManch, yet again: this time it were stories Ghalib ke Parsai and Asahamat, masterpieces by Harishankar Parsai.

Following this, we had An One act play in English based on the Story "Bade Bhai Sahab" by Munsi Premchand, presented by Crossroads Serenaders. The participating teenagers had presented the same a couple of years ago. It was interesting to see how their interpretation and acting matured with time.

The final act for the evening was a recital of o henry's Let me feel your Pulse, through a mono-act. the act revolved around the creative genius of O.Henry. the curtain fell for the second stream with this.

The grand finale of Ranga Mohana was finally here. The two day affair was grand in its planning, performances and presentation.

Meghnad Badh Kabya was introduced. Story of Killing (or Badh) Meghnad, the son of Ravana, created controversies among many intellectuals during post modern era; Many renowned righters including Tagore started challenging all good image of Avatar Rama and his team; Sense of right and wrong had been re-evaluated through their literary creations. Michael Madhusudan Dutta wrote this epic in Bengali language during 1861, more or less sticking to the original Story of Valmiki's Ramayana albeit with his great genius of choice of words and picturesque description of every scene, every emotion and every character.

Goutam Halder depicted the characters with such finesse and the aura created was overwhelming. T was a learning experience for the theatre enthusiasts.

The final day for the season started with a heart wrenching play by Asakta, Pune. Timeline was January 1948. Palestine. The British Mandate was ending. The UN was voting on who would control what part of the land… Amidst all this, Ali was in love with Nada – but he was in despair. Nada's father won't let them marry because his brother Yusuf is 'odd' with his own eccentric, child-like point of view. War began, amidst households and among countries. As the villagers got scattered and became refugees, the secret that's kept Ali and Nada apart was revealed. A powerful, poetic exploration of different forms of love, Main hoon Yusuf aur yeh hain mera bhai had left all the members in the audience teary-eyed. It was emotionally powerful yet crumbling at points. It was an experience worth having.

Shakespearean play Othello needed no introduction; there could be no question about the popularity of this play since this was being performed since time immemorial. The interpretation of love, passion and the enacting of the essence of possessiveness had been the keynotes of the Play Othello. Noye Natua's interpretation of the same had brought out the subtleties of tragic love, marred by jealousy in much grand manner. It was perhaps the best way to pull the curtain on Ranga Mohana 2016-17.

The three streams confluence and how! Our senses were enriched with brilliance, and our soul energized. Yes, the heart was heavy and there was a emptiness within. The festivity finally came to an end. And then as someone correctly said, it ended tonight only to come back next year.

Throughout the season, our vision remained the same … "from professionals and serious enthusiasts to amateurs and curious explorers, will meet under a single roof to express their performing Arts, discuss their ideas share their opinions, and even learn a thing or two"

A workshop was organised in the month of July. Shatabdi from Kolkata was invited to facilitate the workshop. A three day long workshop addressed the third theatre format. The experience gained was not limited to one form, though the framework.eas concentrated on that. It was a wholesome experience. Ideas were exchanged. Thoughts were discussed. Creativity was enriched. The workshop moulded the minds and opened the thought flow to a greater dimension. The basic body works, the movement techniques, the physicality was practised. An actor or an act is incomplete without the soul. How to feel the essence of any play and portrayed the same was the next steo in the workshop. This was a learning milestone for the members of SEPAI.

Towards the later half of the year, crossroads serenaders was invited by Samiksha to perform for the cancer fighting kids at the Kidwai hospital. They presented Pinocchio. The play was for the children and they loved it. With every passing moment, they cheered more

and the experience was humbling. Their laughter during the show resonated the unblemished spirit of a child. The learning made a huge impact for SEPAI.

The year progressed with two shows for Michhil. In the ehaet of Bangalore, Enad brought Michhil to the drawing room of the yellow Submarine 3, breaking the myth that stage is required for an effective performance. People were left teary eyed at the impact of the play. It was history in itself. SEPAI put forth the idea that any space can be utilised for expression of art.

The year ends with two in house production of SEPAI. Two Bengali plays, chalaman asariri and pagla GhoDa. The common link between these two is the unreal. But the plays are far more deep and thoughtful.

Palette stands as a testimony to the variety of arts exhibited and celebrated, along with the artists. It was a year that showcases a plethora of art forms and performances, reiterating the fact that art is everywhere and in everything one must pause and feel the essence. It will grow on one and make one richer by experience.

কমফর্টটা আসলে একটা ফাঁদ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

(বর্তমানে বাংলা থিয়েটার জগতে অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী এক পরিচিত নাম। অভিনয় করেছেন ‘জগন্নাথ’, ‘মারীচ সংবাদ’, ‘মেফিস্টো’, ‘চিরকুমার সভা’, ‘গ্যালিলিও’, ‘ট্রয়’, ‘ফেরা’, ‘তুঘলক’, ‘মানুষ ভূত’, ‘কাচের পুতুল’, ‘গোপাল অতি সুবোধ বালক’, ‘ঘটক বিদায়’ প্রভৃতি নাটকে। বাংলা সিনেমা ‘ফড়িং’ এবং হিন্দি ‘মেরি প্যারি বিন্দু’-তেও তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। ‘প্যালেট’-এর জন্যে সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের শেখার ঝুলি উজার করে দিলেন।)

এতোগুলো নাটকে অভিনয় করার পর নাটক সম্পর্কে আপনার ভাবনার দিকটি কী?
__ যদি ভাবি নাটক আমাকে কী দেয়- এককথায় বললে ‘আনন্দ’। এমন আনন্দ যা আর অন্য কিছুতে পাই না। আমি শিক্ষকতা করতাম, সাথে থিয়েটার। কিন্তু থিয়েটারের টানে আমি শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিই দীর্ঘ ১৪ বছর পর। ভালোলাগা আর আনন্দের পরিমাণ কতোটা বেশি হলে এই ঝুঁকি নেওয়া যায়! মাঝেমাঝে মনে হয় আমি এই থিয়েটার- অভিনয় বাদে আর কিছুই করতে পারি না।

আমি শুধুই একজন অভিনেতা, তাই আমার নাট্যভাবনা মূলত একজন অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। নাটকের বিভিন্ন genre/ formবিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে আলোকবৃত্তে আসে; কখনো রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধাণ্য পায়, কখনো বেশি দেখতে পাই পারিবারিক মূল্যবোধের নাটক, কখনো পুরাণনির্ভর নাটক। আমার মনে হয় সব ধরণের নাটক একইসাথে, একই সময়ে সহাবস্থান করাটা জরুরী। তাতে দর্শকদের ভালো, নাট্যকর্মীদের ভালো, নাটকের ভালো।

এখন প্রযুক্তির ব্যবহারের দিক থেকে আমরা অনেক উন্নত। অনেক এক্সপেরিমেন্টাল কাজ হচ্ছে। কিন্তু মাঝেমাঝে ভয় হয়—সোলটা হারিয়ে যাচ্ছে না তো! তাহলে খুব বিপদ। পারফর্মিংটা আর্ট যদি মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার আত্মাকে যদি ছোঁয়া না যায় তাহলে তা অভ্যাস করায় বা দেখায় আর কোন আনন্দ থাকবে না।

চরিত্র নির্মাণ করতে গেলে নিজেকে কিভাবে তৈরি করেন ?

__ একটা চরিত্র করার প্রত্যেক অভিনেতার নিজস্ব প্রসেস থাকে। আমি মূলত চরিত্রের মন আর মস্তিস্ককে বোঝার চেষ্টা করি। অর্থাৎ তার ভেতরের জগৎটাকে বোঝার চেষ্টা করি—মানুষটা কেমন। চরিত্রের অনেকটা বলা থাকে কিন্তু অনেকটা বলাও থাকে না। সেটা ক্রিয়েট করতে হয়। সেই কাজটা শুরু হয় কতগুলো ফ্যাক্টের ওপর—চরিত্রের ব্যাকগ্রাউন্ড – তার সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা করা গেলে তবেই তার অন্তরটা দেখার চেষ্টা করা যায়। আমি কখনোই চরিত্রের বাহ্যিক দিকটা নিয়ে মানে সে কিভাবে হাঁটবে, কিভাবে দাঁড়াবে, কিভাবে কথা বলবে, কিভাবে বসবে—এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। এগুলো অটোমেটিক্যালি সিন্থেসাইজড হয়। রিহার্সাল চলাকালীন সেগুলোর পরিমার্জন ঘটে। কিন্তু বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় বা আগেই সেগুলো স্থির করে নেওয়ার আমি বিরোধী।

কোন চরিত্র আর একটি সমগোত্রীয় চরিত্রে ছায়া ফেলে কী? যদি তা না ফেলে তা হলে কিভাবে নিজেকে তার থেকে সরিয়ে রাখেন?

__ প্রত্যেকটা মানুষ যেমন আলাদা , প্রত্যেকটা চরিত্রও তাই। আমি ‘ছায়া ফেলা’-র ব্যাপারে সতর্ক থাকি না। একটা নতুন চরিত্র—একটা নতুন মানুষ। তাকে আবিষ্কার করার মজাটাই তো হারিয়ে যাবে যদি তাকে কারোর মতো ভেবে ফেলি আগে থেকেই! দু’একটা ট্রিট হয়তো আগের কোন চরিত্রের মতো হতেই পারে—কিন্তু সেটা কোকন্সিডেন্সের বেশি কিছু নয়। আমার আগের করা কোন একটি চরিত্রের বিশেষভাবে কথা বলা বা কোন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি দর্শকদের ভালো লাগে আর আমি যদি সতর্কভাবে সেটা রিপিট করতে করি অন্য চরিত্রগুলোতেও – তাহলে সবার আগে আমি নিজেই বোর হয়ে যাবো। দর্শকরাতো হবেই। কেউ হয়তো এই ধরণের ‘প্রভেন পাথ’- এ নিজেকে রিপিট করে কম্ফর্টেবল ফিল করেন, ভাবেন এটা স্টাইল—কারণ দর্শক এটা আগে পছন্দ করেছেন। কিন্তু এই কম্ফর্টটা আসলে একটা ফাঁদ।

আপনি যদি কোনসময় নাটক শেখান তাহলে, কিভাবে শিক্ষার্থীদের তৈরি করবেন?

__ আমি কিছু কমিউনিটি থিয়েটার প্রোজেক্টের ডিরেকশন দিয়েছি, কিন্তু তার বাইরে পরিচালনার কাজ করিনা। থিয়েটারের তো অনেক ডিপার্টমেন্ট—লাইট, সেট, মিউজিক, মেক-আপ, কস্টিউম। এর প্রত্যেকটার জন্যে টেকনিক্যাল পড়াশুনোর প্রয়োজন। আমি এর অনেককিছুই খুব বেশি জানি না। ইনফ্যাক্ট আমি অভিনয় নিয়ে কোন ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনো করি নি। আমার পড়াশুনা ব্যক্তিগত স্তরে এবং বাকি শেখাটা দীর্ঘদিন থিয়েটারে যুক্ত থেকে- দেখে। তাই আমি যদি কোনদিন শেখানোর যোগ্যতা অর্জন করি, তাহলে যেটা শেখাবো সেটা একেবারেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমি নিজে যে প্রসেস ফলো করি হয়তো সেটা আমি শেয়ার করতে পারি। টেক্সট থেকে প্রোডাকশন এই জার্নিতে আমি তাদের সাথে নিয়ে চলতে পারি। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে—‘অভিনয় শেখানো যায় না, কিন্তু শেখা যায়’।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত

ইন্দ্রাণী বকসী

একটা ছোট্ট মেয়ে। একটু একা। সকালের প্রাইমারি স্কুল থেকে ফিরে বাড়ির তিন তলার চিলেকোঠায় নিজের আস্তানায় সময় কাটাতো। দুপুরটা, বিকেলটা। সেইখানে, সে লক্ষ্য করল যে, কিছু কিছু ঘটনা, হঠাৎ ঘটে। আর তাতেই বদলে যায় সব।

যেমন, বেশ বৃষ্টি পড়ছিল ঝমঝম, ঘরের মধ্যে বেতাল কমিকস পড়া চলছিল, হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ, কাকগুলো ডাকছে--বাইরে ছাদে পা রাখতেই, ও মা, আকাশ জুড়ে কি বিশাল রামধনু! সব মন খারাপ পালালো, আকাশের দিকে চেয়ে যেন এক লাফে হঠাৎ বড় হয়ে গেল মেয়েটা। ঠিক করে নিল, এই সব এই হঠাৎ বদল, - সত্যি ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে।

আমাদের "ঘটমান বর্ত্তমান" জীবনে এই রকম হঠাৎ ঘটন চমকের মতন, কিন্তু আমাদের চেতনা এই বিরল মূহুর্তগুলোর জন্যই সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

দুরুদুরু বুকে, নিশ্বাস বন্ধ, তালিকায় নিজের roll no. এর পাশের নম্বরটা দেখার মূহুর্ত, mail box এ appointment letter টা এসেছে, সেই মূহুর্ত, অথবা কারো আসার কথা ছিলো, সে এল না, আসবে না কখনও, -সেই উপলব্ধির মূহূর্ত। কিংবা যন্ত্রণার ঢেউ আর ঢেউ এর মধ্যে সেই মূহুর্ত, যখন সহসা শরীর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে ছোট্ট নতুন প্রাণ, - সেই ম্যাজিক। ঘটে যায় এক নিমেষে, কিন্তু সেই ঘটনে বদলে যাই আমরা। বদলে যায় আমাদের সত্ত্বা, আমাদের প্রতিফলন, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, নতুন করে তৈরী হয় সম্পর্ক, নিজের সাথে, পারিপার্শ্বিকের সাথে। ব্যক্তিগত জীবনের এই সব মূহুর্ত, আমাদের আশা দূরাশা স্বপ্নপূরণের সাধের এইসব মূহুর্ত ছাড়াও আছে বৃহত্তর অঘটন বা হঠাৎ - ঘটন,-- যার প্রভাব গোষ্ঠী জীবনে।

একই ঘটনা, প্রভাবিত হই অনেকে, কিন্তু সবাই একই ভাবে প্রভাবিত হই না তো। তাই আমাদের প্রতিক্রিয়া ও হয় নানা রকম, জন্ম নেয় প্রতিঘাত, সংঘাত, -আঘাত। ঘটনা বাহ্যিক না হয়ে মনোজগতে ও হতে পারে, যেমন আজীবন লালিত এক অটল বিশ্বাসের আকস্মিক পতন এক জন মানুষের পুরো সত্ত্বাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। ঘটে যায় অল্প সময়ে, কিন্তু বদলে দেয় সব কিছু। জীবনে নাটকের উপাদান তৈরী করে মিলিয়ে যায়, আর ফিরে আসে না।

তবু আমরা বাঁচি ঐ কটা মূহুর্ত্তের জন্যই, যা বদলে দেবে জীবন, নতুন করে গড়বে, ভাঙবে, আর আমরা নিজেদের আবার নতুনভাবে আবিষ্কার করব।

আমাদের নাট্য মঞ্চে চলে এই মূহুর্ত গুলোরই প্রসারণ বা সংকোচন। ঘটনা ঘটা চাই। ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সম্পর্কের ওঠা পড়া, ঘাত প্রতিঘাত, আর আমাদের আবেগের। এই আবেগকে একটু অণুবীক্ষণ করে, উপযুক্ত আঙ্গিকে তার সুষম বিবর্ধিত রূপের শৈল্পিক পরিবেশনই আমার কাছে নাটক।

অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে

প্রণব বসু

বিশ্বাস করুন, তুহিনের প্রচেষ্টায় কোন খামতি নেই| যাকে বলে আদা জল খেয়ে লেগে যাওয়া। এই আজকেই দেখুন না, ‘এলার্ম’ দিয়ে ভোররাতে উঠে লড়ে যাচ্ছে| আজ রবিবার। কোথায় স্বভাবমত আলসেমি করে অন্যান্য ছুটির দিনগুলোর মত দেরীতে উঠবে, শীতের নরম রোদে পিঠ দিয়ে কফির পেয়ালা হাতে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাবে- তা নয়, ‘স্ক্রিপ্ট’ হাতে পায়চারী করছে আর একটানা ঠোঁটদুটো নড়ছে। দেবুদা আলটিমেটাম দিয়েছেন - আজ শেষদিন। হয় মুখস্থ, নয় বাদ।

কি লজ্জা! কি লজ্জা! দু’মাস ধরে মহলা চলছে। অথচ তুহিন এখনো সংলাপ নিয়ে খোঁড়াচ্ছে। মহলার মাঝে সংলাপ ভুলে যায়, ফলে মহলার গতিতে যতি পরে। সহ-অভিনেতারা ‘ধ্যাত’ বলে এমন চোখে তাকায়, নিজেকে নরকের কীট বলে মনে হয়। দেবুদার ঠান্ডা মাথা, কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থম মেরে বসে থেকে বলেন- নাও ধর! সেই দেবুদাও এবার ভীষণ ‘আপসেট’।

বাবার হাত ধরে তুহিন ‘সাজাহান’-এর মহলা দেখতে গিয়ে পরিচালক জিতুদার খপ্পরে পড়ে। জিতুদা ওকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠেন- আরে ছেলে খুঁজছি, এইতো তুহিন আছে। আর সেদিনই দারাশিকোর শিশুপুত্রের ভুমিকায় ও ফিট হয়ে গেল। তখন বয়স হবে সাত কি আট। তুহিনের সেই শুরু, আজ প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। এরপর পাড়ায়, স্কুলে, কলেজে অনেক নাটক করেছে- এখন নাটকের দলে। তবু এখনও কি মহলা, কি মঞ্চে-সংলাপ বলতে গেলে তুহিনের হাঁটু ঠকঠক, বুক ধড়াস ধড়াস - এই বুঝি ভুলে গেলাম, এই বুঝি ভুল সংলাপ বললাম। সহ- অভিনেতাদের সংলাপে মন না দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ‘কিউ’-এর জন্যে অপেক্ষা, আর তারপর রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে বলে যাওয়া।

দীর্ঘদিন জিতুকাকুর পরিচালনায় তুহিন নাটক করেছে। নাটক সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু বলতেন। তুহিনের কিছু কথা এখনও মনে আছে। যেমন-

একঃ নাচ, গান, বাজনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি নাটক ছাড়া যে কোন শিল্পই ইচ্ছে করলেই জনসমক্ষে হাজির করা যায় না। এর প্রতিটির জন্য শিল্পীকে দক্ষ শিক্ষকের কাছে দীর্ঘদিন ধরে প্রথা অনুসারে তালিম নিতে হয়। বহু বছর ধরে একাগ্রমনে সাধনা করতে হয়। তবেই শিল্পী তৈরী হয়।

দুইঃ নাটকের ব্যাপারে ঐসবের বালাই নেই। মুষ্টিমেয় ছাড়া সবাই পাড়ার দাদা কাকাদের হাত ধরে মঞ্চে নাবেন, যেমন তুহিনের বেলায় ঘটেছে। কিছুদিন অভিনয়ের পর পরিচালক হিসাবে অনেক অভিনেতার পদোন্নতি হয়। দাদা কাকাদের ইতিহাসটাও একই রকম।

তিনঃ অভিনয়ের মত সহজ জিনিষ আর হয়না। মঞ্চে উঠে ‘স্ক্রিপ্ট’ অনুযায়ী বলতে পারলেই হবে। এক মূক ছাড়া যে কেউ পারে। মঞ্চভীতি ? দু’চারটে নাটক করার পর সেটা মিলিয়ে যায়। সেন্ট পার্সেন্ট মুখস্থ চাই, অভিনয়ের অন্য সব দশ বিশ পার্সেন্ট হলেও ক্ষতি নেই। কারন অভিনয়ের ‘ট্যালেন্ট’ তো সবার এক না। |

চারঃ চরিত্র নির্মান পরিচালকের কাজ। তিনি তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী অভিনেতাকে তৈরী করে নেন|। এতে কোন ‘বেঞ্চমার্ক’ নেই। খালি অভিনেতাকে পার্টটা ভাল করে মুখস্থ করতে হবে। দর্শক নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র ফুটে উঠল কি না তানিয়ে অত মাথা ঘামান না, ভাল লাগলে হাততালি দেবেন।

তুহিন বোঝে আসল কথা মুখস্থটা ভাল মতন করতে হবে। কিন্তু করবেটা কি ভাবে সেটা জিতুকাকু বলেন না।

তুহিন একদিন জিজ্ঞেস করেছিল। হাসতে হাসতে বললেন- প্রশ্নটার উত্তর তুই ভাল মতনই জানিস। স্কুলে কী শেখায়? স্রেফ মুখস্থ!স্কুলের প্রথম দিনই দুলে দুলে মুখস্থ করিস নি, ‘ অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে’? মানে বুঝে পড়াতো দুরের কথা, সে বয়েসে অজগর কি জিনিষ তাইই পড়ুয়ারা জানে না। স্কুল মানেই তো মুখস্থ মুখস্থ মুখস্থ। তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা আর পরীক্ষার খাতায় উগরে ফেলা। নাটকে অবশ্য খাতার বদলে মঞ্চে সেটা করতে হয়। পরীক্ষাটা থেকেই যায়, তবে এখানে পরীক্ষক দর্শক। সুতরাং স্কুলের পড়া তৈরীর মত মন দিয়ে বারবার পার্টটা পড়তে হবে। এতো নতুন কিছু নয়, সবাই জানে। দরকার হলে দুলে দুলে পড়বি। অবশ্য লোকের নজর বাঁচিয়ে, এখনতো তুই আর ছোটটি নোস।

তুহিন তারপর থেকে মুখস্থ করার সময় দুলতে শুরু করে।| তাতেও নিস্তার নেই, একই অবস্থা। সংলাপ ভুলে যায় আর মহলা ঝুলতে শুরু করে । কিছুদিন পরে এক ঝানু অভিনেতা দয়াপরবশ হয়ে তার ‘ট্রেড সিক্রেট’ বলেছিলেন। বয়স হয়েছে তো, এখন দুলে দুলে হবেনা, চলে চলে করতে হবে। তাতেও ওর দুর্দশার শেষ হয়না। ফলে ওর ধীরে ধীরে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় স্কুলের পড়া মুখস্থ করা আর নাটকের সংলাপ মুখস্থ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এক নয়।

ও বুঝে উঠতে পারেনা অভিনেতারা কিভাবে কমা ফুলস্টপ যতি পর্য্যন্ত বাদ না দিয়ে দিনের পর দিন সংলাপ বলে যান!

নাটকের জগতে কর্মশালার এখন খুব চল। অনেক খরচ করে বেশ কিছু কর্মশালাতে তুহিন নাম লিখিয়েছে। নাটক সংক্রান্ত অনেক বিষয় সে জেনেছে, কিন্তু কোথাও ‘মুখস্থ’ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি । জিজ্ঞেস করলে সব কর্মশালার পরিচালকরা প্রশ্নটার কোন গুরুত্বই দেয়নি। ভাবটা এমন যেন ‘সিরিয়াস’ নাটকের জগতে তুহিন এক বালখিল্য। যারা উত্তর দেন, তাঁরা জিতুকাকুর উত্তরেরই পুনরাবৃত্তি করেন- স্কুলে “অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে” ঝেড়ে মুখস্থ করেছ্রন তো? যে ভাবে করেছেন, অই ভাবেই করবেন। ভারত কেন ভূ-ভারতের কোন থিয়েটার স্কুলেরই পাঠক্রমে মুখস্থ বিষয়টা তুহিন খুঁজে পায়নি। ও মহা ধন্দে পড়ে। মুখস্থ হল নাটকের ভীষণ জরুরি অঙ্গ। প্রতিটি নাটকে ও দেখেছে মহলার সময় অভিনেতা পরিচালকের নির্দেশমত অভিনয় না করতে পারলে তাকে তৈরী করার জন্যে তিনি আদা জল খেয়ে লাগেন, অথচ অভিনেতার সংলাপে ভুলভ্রান্তি হলে ‘আপসেট’ হন। সেই অভিনেতা সকলের হাসির বা করুণার পাত্র হন|মুখস্থ জরুরি অঙ্গ যদি নাই হয় তাহলে প্রতিটি রিহার্সালে, প্রতিটি শো’তে ওই প্রসঙ্গ ওঠে কেন? আর জরুরিই যদি হয়, তাহলে ওটার প্রতি আনুষ্ঠানিক নজর না দিয়ে মুখস্থের ভারটা অভিনেতার প্রচেষ্টার ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয় কেন? আমরা প্রায়ই শুনি অভিনয়ে এক একজনের ‘ট্যালেন্ট’ এক এক রকম, আর সেটা নাকি প্রকৃতিদত্ত (যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই), তবে কেনই বা মুখস্থের সামর্থ্যের ব্যাপারটা প্রকৃতিদত্ত বলে মেনে নেব না(অথচ যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে)?

তুহিনের মহা চিন্তা -,

-মুখস্থের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে কি কোন প্রক্রিয়া (‘এক্সারসাইজ’, ’গেমস, ইত্যাদি) নেই?

-মুখস্থের পদ্ধতি চিরাচরিত স্কুলের পদ্ধতির মতই হতে হবে কি?

-অভিনয়ের জন্যে যদি কর্মশালা হতে পারে তবে মুখস্থের জন্যে কেন হতে পারে না?

- মহলার অঙ্গ হিসাবে মুখস্থ অনুশীলনের জন্য কিছু সময় কি রাখা যায় না?

এই সব প্রশ্নগুলো যখন তুহিনের মনে অনবরত ঝড় তুলছে, ঠিক সেই সময়েই ওর চোখে পড়লো ‘দি নিউ সানডে এক্সপ্রেস’ এর ‘ম্যাগাজিন সেকসান’-এ মালায়ালাম লেখক মৈথিল রাধাকৃষ্ণানের ছোট্ট লেখাটা-

“ In typical rehearsal sessions, stage actors start reading words aloud from the script in their hands. And while at it, they get a physical feel of the shape and sound of the lines they would deliver on the stage. Gradually, they go beyond just listening to the words of the characters in their own voice .They begin to internalise the emotions and contexts that make the characters say what they say. By now, the actors have reached a state where no words are delivered in isolation. Everything you say is a response to what others say or do, and words have gathered “motivation” behind them. Since memory is basically a series of connections, we can readily see how all these could help an actor. Words get connected in a dynamic ensemble of facial expressions, body movements, costumes, gestures, postures, and even lighting and sound cues. Thus, as an actor, you remember your lines well not just because you have memorised them, but because it naturally flows to you from every audio-visual cue around. Incidentally, this is quite the opposite of the situation of a student writing an exam in which memorisation plays a critical role. The very nature of exams isolates the students from everybody, everything, every cue outside’.

এ প্রসংগে মহান পরিচালক উৎপল দত্ত মহলায় যে রীতি অনুসরণ করতেন, তুহিন সেটাও প্রানিধান যোগ্য বলে মনে করে (সূত্রঃ অভিনয় শিল্প-সংলাপ ও কন্ঠস্বর, অঞ্জন দাসগুপ্ত, মুঃ১৯৮০, পৃঃ ১৭৬ ,–তাঁর নাট্যগোষ্ঠীর জনৈক সদস্যের উক্তি)--- “আমাদের পরিচালক কখনই চান নি আমরা পার্ট পেয়েই আগে মুখস্থ করি। এমনকি প্রথমেই ‘অভিনয়’ করতেও বারণ করেন। আমরা আমাদের পার্ট পাবার পর তাঁর সামনে শুধুমাত্র পঠন-পাঠন চালাতে থাকি……কোথায় থামতে হবে, কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় কিভাবে নিঃশ্বাস নিতে হবে,…চরিত্রটির কাঠামো বুঝিয়ে দেন। এরপর মডেল সেট নিয়ে মহলা …তারপর আসে দাঁড়িয়ে মহলা দেবার পালা। তখনও হাতে হাতে নিজেদের পার্ট …… (এবার)… শৈল্পিক ছোঁয়া লাগিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিটি সুচারুরূপে প্রকাশ করতে প্রয়াস পান| এত কিছুর পরও পার্ট হয়ত আমাদের হাতেই আছে। মহলায় ‘রাণ থ্রু’র ফাঁকে কখন যে পার্ট হাত থেকে খসে যায় আমরা বোধহয় নিজেরাও টের পাইনা।“

তুহিনের বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যায়। এখন শুধু মুখস্থর পদ্ধতি নিয়ে নয়, কখন মুখস্থ করতে হবে তাই নিয়েও সংশয়। ওর সংশয়, কোনভাবে কখন তৈরী হলে ওর সমস্যা মিটবে। তুহিনের সব সংশয়ান্বিত প্রশ্নের উওর কে দেবে? ও জানে যতদিন না ও উত্তর পাচ্ছে, ততদিন এ ঘর থেকে ও ঘর পায়চারী করতে করতে ও মুখস্থ করে যাবে। সম্ভব হলে গলা ছেড়ে জোরে জোরে, আর মুখস্থের অজগর ক্রমাগত ওকে তেড়ে আসবে। ওর হাঁটু ঠকঠক করবে, বুক ধড়াস ধড়াস।

অভিনেতার কাজ

অমিতাভ বকসী

দীর্ঘদিন ধরে অ্যামেচার থিয়েটারের পুনরুজ্জীবনকে মাথায় রেখে অনেক নতুন নতুন অভিনেতা তৈরি করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে তাদের প্রথম এবং প্রধান বাধাটা হোলো, তারা স্টেজে অভিনেতার কাজটা কি সেটা স্পষ্ট করে বোঝেন না এবং গুরুত্ত্ব দেন না। কিভাবে তারা একটি সংলাপ বলবেন তা প্রায়শই "কেন সেভাবে বলাটা প্রয়োজন এবং বললে তা দর্শক মনে কিভাবে প্রভাব ফেলবে" এই ভাবনাটি থেকে উদ্ভুত হয় না।

এই লেখাটার উদ্দেশ্য সিরিয়াস নতুন অভিনেতাদের জন্য যারা অভিনয় সবে শিখতে শুরু করছেন। এই প্রসঙ্গে Meisner, Brecht, Stanislavski, Strasberg, Adel প্রভৃতি বিখ্যাত (বা কুখ্যাত!) নাট্য ব্যক্তিত্বদের তৈরী "অভিনয় শিক্ষার নানান কৌশলে"র অবতারনা করলে শিশু(!) পাঠ্য রচনাটির প্রতি অবিচার করা হবে। অভিনয় শিক্ষার কৌশলগুলোর বিষয়ে বিশদে অন্য কোনো সময় লিখবার ইচ্ছে রইলো।

খুব খুব সাধারনভাবে বলতে গেলে যে কোনো "ART" এর output টা এমন হবে যেটা Art consumer এর মনোজগতে একটা বিশেষ অনুভূতি জাগাবে। এই আবেগ বা অনুভুতির বোধ যতো গভীর হবে, উপভোক্তার উপর প্রভাব বিস্তারও হবে ততো বেশী এবং উপভোগের মাত্রাও ততো বেশী হবে। Art এর স্রষ্টার লক্ষ্যই হবে কিভাবে সর্ব্বোচ্চ অনুভূতির জন্ম দেওয়া যায়।

নাটকে অভিনেতা মূলত দুভাবে দর্শক মনে প্রভাব ফেলে। প্রথমত: বিশেষ কোনো <u>তথ্য জ্ঞাতসারে এনে;</u> দর্শক কখনো তথ্যটির নতুনত্বে চমকিত হন অথবা তথ্যটিতে তার চেনা কোন ভাবনার প্রতিফলন পেয়ে শিহরিত হন। মঞ্চে দেখে, চেনা তথ্যের গুরুত্ব যেন তার মনে হঠাৎই বেড়ে যায় – তাকে নতুন করে ভাবাতে শুরু করে।

এক্ষেত্রে তথ্যটিকে দর্শক মনে স্থাপন করাটাই অভিনেতার কাজ। অভিনয়ের কোনো ব্যাকরণ নেই – এক এক অভিনেতার এক এক রকম অস্ত্র। বক্তব্যকে জোরালো করে তোলাটাই এখানে অভিনেতার কাজ। এ ব্যাপারে কটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে-

১। বক্তব্যটিকে স্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণে উপস্থিত করা প্রয়োজন। কথা শোনা বা বোঝা না গেলে সব মাটি।

২। বক্তব্যটি সম্পূর্ণভাবে নিজে উপলব্ধি করতে হবে এবং প্রতিবার অভিনয়ের সময় সচেতন ভাবে সেই কথাগুলি বলবার সময় উপলব্ধি করতে করতে বলতে হবে, যেন এইমাত্র উপলব্ধিটি মনে এলো প্রথমবার। সেটি যেন অভিনেতার নিজেরই কথা হয়ে ওঠে। এমন হতেই পারে অভিনেতা বক্তব্যকে সমর্থন করছেন না- সেক্ষেত্রে অভিনেতা সেই চরিত্রে অভিনয় করবেন না—অথবা আরও একটি উপায় আছে – " অভিনেতা নকলভাবে ফাঁকি দিয়ে উপলব্ধির ভান করবেন। Art মানেই তো artificial। তাই এতে দোষ নেই; তবে এই ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে খুব দক্ষতা চাই; ফাঁকি ধরা পড়ে গেলেই মুশকিল।

দর্শককে প্রভাবিত করার দ্বিতীয় উপায়টি হোলো তাদের মনটিতে প্রয়োজন মতো বিশেষ আবেগ সঞ্চার করা – সেখানে তারা চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে ফেলবেন নিজের অজান্তেই- রেগে যাবেন, হেসে উঠবেন, মন খারাপ করবেন। নানান ধরণের acting techniques ব্যবহার করে এই প্রভাব ঘটানো যায় কিন্তু সেটা এই লেখাতে আলোচনার অবকাশ নেই।

যেভাবেই ঘটানো হোক, এই প্রভাব ঘটানোটা খুব কঠিন; কঠিন প্রধানত: কয়েকটি কারণে-

১] একসাথে অনেক দর্শকের মনোজগতে একইরকম আবেগ জাগানো – সবার অভিজ্ঞতা, তাৎক্ষনিক মানসিক অবস্থান তো একরকম হবে না

২] খুব চেষ্টা করে কাজটা করতে গেলে ব্যাপারটা অতি নাটকীয় / আরোপিত হয়ে যেতে পারে – খুব সুক্ষ্ম ব্যালেনসের দরকার।

এ ব্যাপারে তাহলে অভিনেতার কাজটা কি?

১] এখানেও প্রথম কাজ – চরিত্রকে "জলবৎ তরলম্" বুঝে ফেলা। চরিত্রের আবেগকে প্রকাশ করতে হবে একেবারে নিজের মতো করে- দর্শককে কোথাও বুঝতে দেওয়া চলবে না যে এখানে কোনো বানানো ব্যাপার চলছে। এই unreal একটা space এ একটা real চরিত্রের আবেগটা প্রকাশ করাটাই আসল কাজ।

২] আবেগের চরিত্র খুব জটিল হওয়া চলবে না। যত জটিল হবে ততো বেশী সংখ্যক দর্শক বিশেষ আবেগটি না পেয়ে নানা রকম পাঁচমেশালী অনুভূতির দ্বারা বিভ্রান্ত হবে।

যদি ধরে নি ই বাৎসল্য, হতাশা, রাগ, দুঃখ, প্রাপ্তি, আনন্দ এগুলো প্রাথমিক স্তরের অনুভূতি তবে দুই স্তরের অনুভুতি হবে প্রাপ্তির আনন্দ, হতাশায় রাগ, দুঃখের হাসি. . . . আমরা ২ বা বড়জোর ৩টি স্তরের অনুভূতির আবেগকে স্পষ্ট করে তুলতে পারি।

৩] সারা নাটক জুড়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে একটি চরিত্রের আবেগ ক্রমাগত বদল হতে থাকে। এই আবেগের প্রবাহটি যেন স্বাভাবিক হয়। কোন ভাবনার ফলে চরিত্রটি এক আবেগ থেকে অন্য আবেগে পৌঁছোচ্ছে তার একটা স্পষ্ট পরিকল্পনা গড়ে তোলা অভিনেতার কাজ। সংলাপের বাইরে থাকা এইসব ভাবনার স্তরগুলোকে অভিনয়ে পরিষ্কার ভাবে আনতে পারলে আবেগের প্রবাহটি হবে স্বাভাবিক, প্রভাব বিস্তার হবে সহজ।

এক কথায় - অভিনেতার কাজ হোলো তার অভিনয়ের দ্বারা কোনো বক্তব্যকে দর্শক মনে স্থাপন করা অথবা আবেগ সঞ্চার করে দর্শক মনে নানরকম অনুভূতি জন্মানো। অভিনয়ের technique বা style অনেকরকম হতে পারে, কিন্তু আসল কাজ এই দুটোই, এই কথাটা মাথায় রেখে অভিনয় করলে দর্শক কে প্রভাবিত করাটা সহজ হবে।

ব্রাত্য বসুর "নটে গাছ" লেখাতে "চার্লস ম্যারোভিৎজ" এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে ছিলাম। এখানে সেটি অতি প্রয়োজনীয় মন্তব্য মনে করে প্রকাশ করছি –

“অভিনেতা সে যে মনে রাখে। সহজ করে বলতে গেলে, যে নিজের সংলাপ মনে রাখে। মনে রাখে নিজের কিউ, নিজের মুভমেন্টস, নিজের নোটস, প্যান্টের বোতাম আঁট তে, জুতোর ফিতে বাঁধতে, নিজের রিক্যুজিশনস্ সঙ্গে রাখতে, ঠিক সময়ে ঢোকার আর বেরোনোর কথা, সহজ সাধারণ কিছু আর যা কিছু জটিল। অভিনেতা সে যে মনে রাখে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, অভিনেতা সে যার মনে থাকে কেমন লাগে অবহেলা, প্রত্যাখ্যান; গর্ব বোধ হলে, রাগ হলে। স্নেহে কোমল হতে; শৈশবে যতরকম অনুভব, আবেগ আর তার প্রকাশ - সব কেমন লেগেছিলো তার; কেমন লেগেছিলো কৈশোরে, প্রথম যৌবনে, মাঝ জীবনে। অভিনেতা মনে রাখে যতরকম সে নিজে করেছে অনুভব আর অপরের অনুভবের পরিচয় পেয়েছে যতখানি। সে মনে রাখে মানুষের ভাগ্যে যা যা ঘটেছে আবহমানকাল, মনে রাখে তার ইতিহাসের পাঠ। নিজের সংবেদনশীলতার অবয়ব খুঁজে নিতে গিয়ে সে পেয়ে যায় সহমর্মিতার হদিশ।

আরও গভীরভাবে বলতে গেলে, অভিনেতা সে যে মনে রাখে “সভ্য- শিক্ষিত” হবার আগে শরীরে বাসা বেঁধেছিল যতসব আদিম আবেগ. .. মনে থাকে এই আমি হয়ে ওঠার আগে সে নিজেই বা ছিলো কেমন।

স্মৃতি নেই কোনো, তবু অভিনেতা – তেমন হয় না কখনও। অভিনেতা সে যে মনে রাখে।“

পরিকল্পনার স্তরে নতুন অভিনেতা অনেক কিছু ভাবেন, ব্যাখ্যা করেন, সেই সময়ে এবার থেকে হয়তো প্রভাব বিস্তার করার কথাটাও মাথায় থাকবে – এবং অভিনয় নির্মাণে এ সমস্তই দরকার – তিনি হয়তো স্মৃতি খুঁড়ে মনে রাখাগুলোকেও বের কর আনবেন; কিন্তু অভিনয়কালে সব কিছু মনে রাখাটা তাই অভিনেতার আরও একটি বড়ো কাজ।

এনাদ পরিবার ও একটা খোলা জানলা

ঐন্দ্রিলা লাহিড়ী

ছোটবেলা থেকে নাটকের সাথে তেমন যোগাযোগ ছিল না। কলকাতায় দীর্ঘ একুশ বছর থেকেও থিয়েটার শব্দটার তেমন কোনও মাহাত্ম্য ছিলো না আমার জীবনে। তারপর ব্যাঙ্গলোরএ এলাম। পরিচয় হলো অমিতাভদা এবং এনাদ নাট্যগোষ্ঠীর সকলের সাথে। নাট্যগোষ্ঠী বলাটা ভুল, আসলে আমরা একটা পরিবার। এই পরিবারের মূলে রয়েছে নাটক। আমাদের পরিবারের সমস্ত সদস্যদের এক অসামান্য টানে বেঁধে রেখেছে এই থিয়েটার। থিয়েটার শব্দটার অর্থ আমি শিখেছি অমিতাভদার কাছে। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন যে নাটক হলও সাধনার জিনিস এবং এই সাধনার গোড়ায় রয়েছে ভাবনা। ভাবনা হতে হবে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। তবেই নিজের কল্পনা শক্তিকে উন্মুক্ত করতে পারবে অভিনেতা। একটা বন্ধ অন্ধকার ঘরে আলোর শিখা দেখতে শেখায় থিয়েটার। মন খুলে মানুষের সাথে মিশতে শেখায়ও এই থিয়েটার।
আরো মন দিয়ে কাজ শিখতে চাই। আগামী দিনে। থিয়েটারকে আমার জীবনে নিয়ে আসার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ এনাদের কাছে।

On Intention

Abhishek Majumdar

Walk into any drama school in the world, which deals with text, and there will be conversation about 'intention'.

Actors world over, at least since the time of Stanislavsky, have focused on two primary questions while delivering their dialogue:

a. What is the intention of the line
b. On which word will the intention be manifested to its maximum

Of course, it is needless to say that, there are many kinds of theatre which do not rely on the word as much and also some methods of acting which do not rely on the psychological meaning of the word. However, here we are curtailing our discussion to, situations where the word indeed is something to be worked upon by the actor and the psychological, functional and metaphoric meaning of the word is central to the process.

I have had the good fortune of directing some very fine actors in many languages and in different places and to me where the actor places the 'intention' is key to understanding what school of drama the actor comes from.

.. In England for instance many actors place the intention within the line.

So for instance, if one was saying 'To be or not to be, that is the question', a British trained actor would often discover the intention on ' Not' or ' That' . Sometimes on either of the 'Be's .

. Typically an actor, trained in an American school will place the intention before the line. So the line will get colored by the already existing intention. Its cadence will be either in the beginning or the end, because obviously the big change of thought in this case occurs when the line begins or ends.

In Germany, something else often happens. The focus on intention is often foregrounded in a more rhythmic practice and observation. It is a more expressionist school in general.

In India, we often see this difference in Hindi and Bangla theatre.

In bangla theatre often the intention is before the line whereas a typical Hindi speaking actor's training is in the Elkazi School which is the British system and hence the intention would be within the line.

Of course there are exceptions to this, but in my experience of working in these situations, I am tempted to believe that the link between the drama school and the rehearsal room is not a small one.

Hence when a director is directing, it is helpful for him/her to spot the school the actor is coming from. Every actor translates direction into their own language. Often in rehearsal the greatest challenge is this translation.

Once a director spots, where exactly does the actor have a tendency to place the intention, it is a question of pointing to the place where you think it works best or to ask the actor to provide options in case one is not happy with the first choice (god forbid one is, even then there is great value in the exploration)

The paradox always is, as follows:
If the actor changes their thinking about intention to what the director suggests, they often do not remain the same actor. If they don't, they may not be as effective for the complete canvas of a good play that explores different emotions through different scenes. This is not a craft problem but intrinsically a philosophical question. Where does a human being begin their intent when thought translates to speech?

The only work out I have found to this paradox is to work with actors who can move the intention up and down the scale (and believe me not everyone can. It is one of the hardest things to do) and can provide options. To stress on 'question' and stress on 'To be' are two different monologues. And this is not so much a matter of Shakespeare's meter as it is about world view.

Ultimately it is pointless to tell an actor, this what she doing is too loud or too underplayed or so and so is too melodramatic etc. All these instructions do, is to elaborate one's taste to the actor. It might translate to a one off good rehearsal but it has not theatrical merit in the long run.

Hence the director must intend to be open to working with many actors for the beauty and risk they bring to the work but also watch out for where exactly does the intention lie, when Hamlet is alone.

[Abhishek Majumdar - Once when asked, "Can you give away your car?", he said Yes and when asked, "Can you give away theatre?", his answer was a strong No.

That he is Abhishek Majumder, the founder of Indian Ensemble, one of the leading theatre companies in India. The recipient of Shankar Nag award, he is passionate and warm.

On requesting to write for Palette, he shared his experience of different theatre spaces he explored across the globe. The write-up leaves you richer by experience.]

বাংলা নাটক এবং নাট্যসাহিত্য

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক জাতির লোকনাট্য থেকেই সেই জাতির নাটকের উৎপত্তি এবং বিকাশ। আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু এর দৃষ্টান্ত নেই। অর্থাৎ লোকনাট্য নাটকের জন্ম দেয়নি বরং নাটক থেকে লোকনাট্য জন্মেছে। সত্যিই অবাক করার মতোই ঘটনা। যেখানে আমরা জানি গ্রীসে তথা সমগ্র ইউরোপে লোকগান থেকে লোকনাটক তারপর নাটকের উদ্ভব সেখানে ভারতে সরাসরি নাটকের উদ্ভব আমাদের তো আশ্চর্য্য করবেই। অনেকে মনে করেন ইংরেজি শিক্ষার পরেই আমাদের দেশে নাট্যসাহিত্যের প্রসার ঘটে। কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে পুতুল নাচ, ছায়ানৃত্যের উল্লেখও করেছেন। তবে সংস্কৃত ঋকবেদ ও রামায়ন- মহাভারতের কাছে বাংলা নাট্যসাহিত্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।

নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে ভরতমুণির 'নাট্যশাস্ত্র'-এ যে কাহিনীর উল্লেখ আছে তা হলো, সৃষ্টির পরে ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে আবেদন করলেন চক্ষু-কর্নের আনন্দদানকারী এমন একটি উপায় তৈরির জন্যে যাতে সকলের অধিকার থাকবে। ব্রহ্মা ঋগবেদ থেকে বানী, সামবেদ থেকে গীতি, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে অনুভূতি ও রস গ্রহণ করে অপর এক বেদ তৈরি করেন। এই বেদই পঞ্চমবেদ বা নাট্যবেদ নামে পরিচিত।

নাটক শব্দটির মধ্যে নাটক আসলে কি তার ইঙ্গিত আছে। নাটক, নট, নটী—এই শব্দগুলোর মূল শব্দ হলো নট্। নট্ মানে নড়াচড়া করা, অঙ্গ সঞ্চালনা করা। ড্রামা শব্দটি এসেছে গ্রিক ড্রাসিন থেকে। যার অর্থ টু ডু বা কোন কিছু করা। সাহিত্যের প্রাচীন রূপকে কাব্য বলা হতো। কাব্য ছিলো দু'প্রকার। শ্রব্য ও দৃশ্য। যে কাব্য অভিনয় করে দেখানো হতো তাই দৃশ্যকাব্য। কিন্তু নাটককে শুধু দেখার বিষয় বললে পুরোটা বলা হয় না। এতে শোনার বিষয়ও যেহেতু থাকে তাই এটা একটা মিশ্র শিল্প মাধ্যম। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল নাটকে তিনপ্রকার ঐক্যের কথা বলেছেন। এই ঐক্যগুলো হলো—কালের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। আবার নাটকে একটা কাহিনী যেভাবে অগ্রসর হয় তাকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। পর্বগুলো হলো—কাহিনীর আরম্ভ বা মুখ, কাহিনীর ক্রমব্যপ্তি বা প্রতিমুখ, কাহিনীর উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব বা গর্ভ, গ্রন্থিমোচন বা বিমর্ষ, যবনিকাপাত বা উপসংহৃতি।

১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর দিনটি বাঙালী নাট্যপ্রেমীদের ইতিহাসে এক তাৎপর্যময় দিন। বাংলা থিয়েটারের ও বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয়ের সূচনা এই দিনটিতেই। হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ নামে জনৈক রুশদেশীয় সঙ্গীতশিল্পী, ভাষাবিদ ও পর্যটক ইউরোপীয় রীতিতে প্রসেনিয়াম মঞ্চে স্থানীয় কলাকুশলীদের নিয়ে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন। সেই নাটক ছিল প্রহসন ' দ্য ডিসগাইড'-এর বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক রঙবদল'। ওইদিনই মাচা বেঁধে বর্তমান এজরা স্ট্রিটে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্ভাবন হল। বাংলা থিয়েটারে নারীদের অভিনয়ের সূচনাও সেই প্রথম।

এরপর শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে 'কীর্তিবিলাস', ' ভদ্রার্জুন', 'শকুন্তলা', 'মালতী' ইত্যাদির অভিনয়য় চলতে থাকে। মধুসূদনই প্রথম সংস্কৃত প্রভাববর্জিত নাটক রচনা করেন। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী',' বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ইত্যাদির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সেসময় সবচেয়ে আলোড়ন তুলেছিল দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ'। মধ্যযুগে বাংলা নাটকে ঐতিহাসিক ও পৌরানিক নাটকের প্রাধান্য দেখা গিয়েছিলো। 'হরিশচন্দ্র', 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় হতে থাকে। ঠিক

এইসময় গিরীশ চন্দ্র ঘোষের আবির্ভাবে নাটকের মান উন্নত হতে থাকে। ‘প্রফুল্ল’, ‘বলিদান’ ইত্যাদি বিখ্যাত নাটকের রচয়িতা তিনিই। এছাড়াও বিহারীলাল, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখরাও সেসময় বাংলা নাটকের গতিকে প্রবল ধারায় বইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা নাটকের আধুনিক যুগ সুরু হয়েছিলো বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। এ যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো নাট্যকার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কবি- সাহিত্যিকও নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন আর বাংলা নাটক তার বিভিন্ন ধারায় বিস্তৃত হয়েছিলো আপন স্বভাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাংলা নাট্যজগতে নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় নাটক নির্মাণের হাল ধরেছিলেন তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, উৎপল দত্তের মতো দিকপালেরা। আধুনিক কালের নাটক মঞ্চের দৃশ্য পরিকল্পনা, আলোক সম্পাত, শব্দ সংযোজনা প্রভৃতি কলাকৌশল প্রয়োগে আরও প্রাণবন্ত ও সাবলীল মাত্রা পেতে শুরু করেছিলো।

বর্তমানে কোলকাতা ও তৎসংলগ্ন মফস্বলকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটক আবর্তিত। রঙ্গমঞ্চগুলোও মূলত শহর কেন্দ্রিক। বাংলা নাটক এখন প্রবাসেও অভিনীত হচ্ছে। কোলকাতার নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় দেখার জন্যে প্রবাসী বাঙালী ছুটে আসছে মঞ্চের কাছে। কিন্তু বাঙলার গ্রামাঞ্চলে নাটকের প্রসার এখনও পর্যন্ত সেভাবে হয় নি। নাট্যশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ও সর্বজনীন করে তুলতে গেলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নাটককে ছড়িয়ে দিতে হবে।

দড়ি ও একটি ট্র্যাজেডি

সুপ্রিয়রঞ্জন কর

তখন ক্লাস ফাইভ । ছোট স্কুলের চৌহদ্দি পেরিয়ে সবে বড় স্কুলে ঢুকেছি । বাড়ির পাঁচশ মিটারের মধ্যে স্কুল। তা একদিন স্কুল থেকে ফিরে একথালা ভাত, মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে বাড়ির পেছনের উঠোনে পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে মার্বেল খেলছি এমন সময়ে মায়ের হাঁক । সবে একটা মার্বেল পকেটস্থ করেছি দিল সব বিগড়ে।

স্কুল থেকে ডাক এসেছে । বাংলার মাস্টারমশাই ডাক পাঠিয়েছেন । বাড়ির কাছে স্কুল হওয়ার এই এক যন্ত্রণা । মাস্টারমশাইরা প্রায় সবাই বাবার চেনা, অনেকেই বন্ধু স্থানীয় । একসাথে পাড়ার ক্লাবে তাস ক্যারম খেলত । তাই আমার কোন অপকর্ম চাপা থাকত না, ঠিক খবর পৌঁছে যেত বাড়িতে কিংবা বাবার কাছে ।

ইতিমধ্যে মার হম্বিতম্বি শুরু হয়েছে । আমি নিশ্চয়ই কিছু গড়বড় করেছি, না হলে স্কুল থেকে ডাক আসে কেন, তাও আবার এই অসময়ে । আমি যতই বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমি কিছু করিনি, অন্তত আজকে, তা কে শোনে কার কথা । আর স্কুল থেকে যে দূত এসেছে, তার কাছ থেকে আর কোন খবর পাওয়া গেল না । ফাটা রেকর্ডের মত খালি বলেই চলেছে, বাংলার মাস্টারমশাই ডাকছেন । আরে কেন ডাকছেন বলবি তো । নেহাত দূত কে বধ করা শাস্ত্রে বারণ ।

আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে স্কুলে পৌঁছালাম । পথে বার বার মনে করার চেষ্টা করছিলাম, এই সপ্তাহে কি কি ঝামেলা করেছি । অবশেষে রহস্যভেদ হল । না যতটা ভেবেছিলাম, অবস্থা ততটা শোচনীয় নয়। আমায় একটা

নাটকে অভিনয় করতে হবে । সামনে সরস্বতী পূজো । প্রত্যেকবারের মত এবারেও নাটক হবে। একটা বাচ্চা ছেলের দরকার । তাই আমার ডাক পড়েছে ।

তা এই ডাকের পেছনে অবশ্য কারন ছিল । বাবা বেশ ভাল যাত্রা, নাটক করত । দুর্গাপূজোর সময় ক্লাবে যাত্রা হত, তাতে বাবা বেশীর ভাগ সময় হিরো । তাছাড়া অফিসের কাজের ফাঁকে বছরে আরো একটা দুটো নাটক কিংবা যাত্রা । অভিনেতা হিসেবে বাবার বেশ সুনাম ছিল । তা মাস্টারমশাই নিশয়ই ভেবেছেন বাপ কা বেটা, কুছ তো হোগা ।

আমি আবার এসবের থেকে শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করতাম । বাড়িতে কেউ এলে অকারণে কবিতা শোনানোটা আমার অসহ্য লাগত । কিন্তু স্কুল বলে কথা, না বলার উপায় নেই ।

তা আমাদের স্কুলে দুটো নাটক হত । একটা “নারী বর্জিত” আর একটা “পুরুষ বর্জিত” । সেই সময়ে গ্রামে ছেলে মেয়ে একসাথে স্কুলে নাটক করছে ভাবা অসম্ভব ছিল । আর বেশীরভাগ নাটকের থিম ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম । এবারের নাটকটাও তাই । পুরো গল্পটা আর মনে নেই কিন্তু এটুকু মনে আছে আমি হয়েছিলাম এক “ব্রিটিশ কুত্তার পা চাটা” দারোগার ছেলে । আমার রোলটা অবশ্য বেশ হিরোয়িক । ঐটুকু ছেলে বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করে, গোপন খবর দেয়, তাদের চিঠি পত্র পৌঁছে দেয় ।

শেষমেশ একদিন সে তার পাজি বাবার হাতে ধরা পড়ে যায় । নিষ্ঠুর বাবা তখন ছেলেকে থানায় দু হাত বেঁধে ঝুলিয়ে, হাবিলদারকে দিয়ে চাবুকপেটা করায় । এমন সময়ে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী থানায় হামলা করে দারোগাকে মেরে ফেলে । এটাই নাটকের শেষ দৃশ্য ।

রোজ স্কুল শেষ হওয়ার পর রিহার্স্যাল শুরু হল। দারোগার ভূমিকায় অভিনয় করত ক্লাস ইলেভেনের চন্ডীদা ।

অবশেষে সেই বিশেষ দিন সমাগত । সরস্বতী পূজোর কালচার‍্যাল প্রোগ্রামের “অন্তিম ও বিশেষ আকর্ষন” আমাদের নাটক । তা নাটক ভালই চলছিলো, খালি চন্ডীদা দু এক জায়গায় পার্ট ভুলে দাঁড়িয়ে গেছিল । স্যার উইন্ডস্ক্রিনের পাশ থেকে প্রম্পট করে আবার ধরিয়ে দিয়েছিল । বেশ কয়েক জায়গায় হাততালিও পড়ল ।

তখন নাটকের শেষ দৃশ্য চলছে, আমার হাতে দড়ি বেঁধে ঝোলানো । হাবিলদার চাবুকপেটার ভান করছে সাথে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে । আমিও মার খাওয়ার জবরদস্ত অতিঅভিনয় করে চলেছি । দর্শক রাগে, দুঃখে, আবেগে আহা উহু করছে, এমন সময়ে আমার ডান হাত থেকে দড়িটা গেল খুলে । এতদিন দুহাতে দড়ি বাঁধা অবস্থায় রিহার্স্যাল করেছি, এখন তার অন্যথা হয় কী করে । আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ

“ও চন্ডীদা দড়িটা খুলে গেছে, একটু বেঁধে দাও”

চন্ডীদাও একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাতের দড়িটা বেঁধে দিল।

খানিক নিস্তব্ধতা । তারপরে দর্শকদের মধ্যে থেকে যে হাসির হুল্লোড় উঠেছিল তা কোনও কমেডি নাটককেও হার মানায়।

মোদ্দা কথা হল, এরপর স্কুল জীবনে আমাকে আর নাটক করতে হয়নি ।

মানুষ হ

সুজয় ঘোষাল

"আমরা যে জানি না, তা নয়। আসলে আমরা অনুভব করি না। যদি করতাম, যদি কণ্ঠনালীতে হৃদপিণ্ডে স্নায়ু-অন্ত্র-পাকস্থলীতে সত্যি সত্যি অনুভব করতাম, তবে সবাই মিলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে যুদ্ধ থামিয়ে দিতাম, দাসত্ব বন্ধ করতাম, জেলখানা তুলে দিতাম, উপবাস হত্যা ধ্বংস সব শেষ করে দিতাম। তখন হয়তো শিখতে পারতাম— ভালোবাসা কাকে বলে।"

১৯৭২ সাল-

যখন পশ্চিমবঙ্গ অতি বাম রাজনীতি এবং তথাকথিত রাজনীতির মাঝে পড়ে নিজের অস্তিত্ব খুঁজতে ব্যস্ত, তখন নাটক জগতেও অন্য এক বিপ্লব নিজেদের প্রথম পদক্ষেপ নিছে বাদল সরকারের হাত ধরে। যেখানে শুধু মঞ্চ থেকে নেমে এসে অভিনয় করাই নয়, মানুষের সাথে মিশে দর্শককেও নাটকের অংশীদার করে নেওয়াটাই সব নয়, সেখানে নিজেও একজন 'মানুষ' হয়ে ওঠাটাই সংগ্রাম।

থিয়েটার কী?

থিয়েটার মানুষের কাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। মানুষের মানুষের বন্ধন।

থিয়েটার কার?

থিয়েটার মানুষের। সব মানুষের সর্বসাধারণের। কিন্তু ভাত- কাপড় থিয়েটার আজ পণ্য। বাজারে বেচা-কেনার মাল। থিয়েটার আজ ক্রেতা- বিক্রেতার বাজারি কারবার। থিয়েটার দেওয়াল- ছাদ নয়। থিয়েটার খোলা মাঠ আর আকাশ। থিয়েটার পোশাকে মোড়া পুঁটলি নয়। থিয়েটার সজীব প্রাণ। থিয়েটার রঙিন কল্পনার বুদবুদ নয়। থিয়েটার জীবনের নগ্ন- কঠিন চেতনা।

আজকের সুসভ্য জগতে বাঁচতে হলে দরকার বর্ম, মুখোস। কয়েক মুহূর্ত বর্ম- মুখোস খুলে ফেলে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ এই থিয়েটার।

(পুনঃ- লেখার অধিকাংশই বাদলদার কাছ থেকে ধার নেওয়া।)

পরিচালকের মনে চরিত্রের রূপরেখার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করি

রাহুল সেনগুপ্ত

- আপনি যখন হৃদিপাশে লাটু উপাধ্যাইয়ের চরিত্র করেন আবার পরের শোতে রিং মাস্টারের রোহনের পার্টে সাবলীলভাবে নিজেকে মেলে ধরেন , শুধু তাইই নয়, এ নাটকে বাঘ এবং রিং মাস্টারের দ্বৈত চরিত্রের বিভাজনে দর্শকের মন ছুঁয়ে যান তখন কী আপনার কখনো মনে হয় চরিত্রগুলো একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ কিংবা একে অপরের ঘাড়ে ছায়া ফেলে যাচ্ছে?

  বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যখন অভিনয় করি তখন একটা চরিত্রের ছায়া অন্য চরিত্রের ওপরে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায় যদি চরিত্রগুলো নিজগুণেই আলাদা আলাদা হয়। হৃদিপাশ'এর 'লাটু উপাধ্যায়' বা রিং মাস্টারের 'রোহন' বা 'রয়' নামে বাঘটির চরিত্র, তাদের সৃষ্টি লগ্নেই অনেক আলাদা। তাই একটার ছায়া আরেকটার ওপরে পড়ার সুযোগ কম।

  আমি নিজে যে খুব সুচিন্তিত ভাবে একটা চরিত্রকে আরেকটা থেকে ভিন্ন করে তুলি তা নয়। এখানে পরিচালকের ভূমিকাও অনেকটাই থাকে। আমি যেটা চেষ্টা করি সেটা হোলো পরিচালকের মনে চরিত্রের যে রূপরেখাটা আছে সেটার কাছাকাছি পৌঁছানোর। সব সময়ে যে পেরে উঠি তা নয়, কিন্তু এই কাছাকাছি পৌঁছানোর যাত্রা পথে কিছুটা আমার নিজস্বতা আর কিছুটা পরিচালকের আঁকা ছবি মিলে মিশে যেটা শেষ অব্দি গিয়ে দাঁড়ায় সেটা হয়তো অন্যরকম একটা কিছু। এবং সেটা অবশ্যই পূর্ব- অভিনীত কোন চরিত্রের আদল নিয়ে আসে না।

- শুনেছি আপনি নাটক করে পারিশ্রমিক নেন না !

  আমি নাটক করে পারিশ্রমিক নিই না এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কোন নাটকে, সব কুশীলবরা যদি পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেন, সেখানে আমাকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হলে আমি তখন তা নিয়েও থাকি। কিন্তু পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করাটা আমার প্রাথমিক শর্ত নয় কারন থিয়েটার করাটা আমার প্রফেশন নয়। ভালোলাগার জায়গা। মনের খিদে মেটানোর জায়গা। তাই পারিশ্রমিক পেলাম কি পেলাম না তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। চরিত্রটা ভালো পেলেই আমি খুশি।

- একদিকে শ্রীজাতার মতো পোড় খাওয়া অভিনেত্রী, অন্যদিকে দ্যুতি হালদার... মহিলা চরিত্রদের এই বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব জখন নাটকের চরিত্র হয়ে ওঠে... সামলান কী করে!

  বাপ রে। এটা তো একটা মারাত্মক প্রশ্ন। তবে সত্যি কথা হোল যে মহিলা চরিত্রদের সামলানোর ঝক্কি আমাকে নিতে হয় নি। বরং উল্টে তারাই আমাকে সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। শ্রীজাতা একজন অসাধারণ অভিনেত্রী এবং খুব সন্দর মনের একটি মানুষ। ওর সাথে কাজ করলে অনেক কিছু শেখা যায় এবং রিহার্সালের সময় ও এত সাহায্য করে , মনেই হয় না যে এত বড় মাপের একজন অভিনেত্রীর সাথে আমি কাজ করছি। দ্যুতির দল ন'য়ে নাটুয়ার হাত ধরেই আমার প্রথম সিরিয়াস থিয়েটারে আসা। অনেকদিনের পরিচিতি এবং বন্ধুত্ব। তাই দ্যুতির সাথে কাজ করতে গিয়ে আমার কখনই কোন অসুবিধে হয় নি। ঠাট্টা মস্করার মধ্যেই আমাদের রিহার্সাল চলে।

■ এই মুহূর্তে গ্রুপ থিয়েটার কোথায় দাঁড়িয়ে?

এই মুহূর্তে গ্রুপ থিয়েটার কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এটা বলা খুব শক্ত। শিকড়ে বাকড়ে একটা বদল ঘটে চলেছে বিগত কিছু বছর ধরে। গ্রুপ থিয়েটারের নিজস্ব যে কর্মপদ্ধতি এককালে ছিল তার থেকে আজকের গ্রুপ থিয়েটারের চলার পদ্ধতি অনেকটাই সরে এসেছে বলে আমার ধারনা। প্রচুর দল, প্রচুর নাটক, প্রচুর গ্রান্ট, প্রচুর প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি, সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা বিশাল কর্মকান্ড ঘটে চলেছে চারপাশে। গ্রুপ থিয়েটারের পাশাপাশি 'কোম্পানি থিয়েটার' নামে আর একটা ঘরানা শুরু হয়েছে। নির্ধারিত হল ভিত্তিক, বা নির্ধারিত সময় ভিত্তিক নাটক তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন থিয়েটার স্পেস খুঁজে বার করা হচ্ছে, থিয়েটার কে ক্যামেরা বন্দি করে টি ভি চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে......... এক কথায় অনেক কিছু হচ্ছে থিয়েটারকে ঘিরে। এর মধ্যে তথাকথিত গ্রুপ থিয়েটার কোথায় লুকিয়ে আছে ঠাহর করা মুশকিল। কিন্তু এসবের মধ্যেও আশার কথা হল যে অনেক কাজ হচ্ছে। অনেক ছেলে মেয়ে পয়সা পাচ্ছে। নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা আসছে। বাণিজ্যিক দিকটাও একটা বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে যদিও, কিন্তু থিয়েটার যে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পথে পা বাড়িয়েছে একথা নিঃসন্দেহ।

■ ভালো নাটক কী হচ্ছে এখন? যদি কোন বিশেষ নাটকের বিশেষ চরিত্রদের পছন্দ হয়, কোন চরিত্রে অভিনয় করতে আপনার ভালো লাগবে?

অনেক ভালো ভালো নাটক হচ্ছে। নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা পরিচালনার দিকে ঝুঁকছে। এটা একটা দারুণ দিক। অটো, ফলসি চড়ার উপাখ্যান, বুক ঝিম এক ভালোবাসা'র মতো নাটকের পাশাপাশি অদ্য শেষ রজনী, একুশ গ্রাম, চার অধ্যায়, মুল্য, অথৈ এর মত নাটকগুলোও হৈ হৈ করে চলছে। অনেক চরিত্র দেখলেই খুব লোভ লাগে। মনে হয় ঈশ, এই চরিত্রটা যদি আমি করার সুযোগ পেতাম…! তবে যে চরিত্রটা স্টেজে দেখে একেবারে প্রেমে পড়ে গেছিলাম সেটা হোল, John Steinbeck এর Of Mice and Men'এ Lennie Small এর চরিত্রটা। হাওড়া ব্রাত্যজনের 'ইঁদুর ও মানুষ' নাটকটাতে শঙ্কর দেবনাথ যে চরিত্রটি করেন। শঙ্কর অসাধারণ অভিনেতা এবং এই চরিত্রটা উনি দুর্দান্ত করেনও। কিন্তু নাটকটা দেখতে দেখতে আমার খালি মনে হয় যে আহা, 'এই না হলে চরিত্র। ঈশ আমি যদি পেতাম.........'

■ নাটক করতে হলে গানের কিছু তালিম থাকা প্রয়োজন বলে জানি। কিন্তু যেটুকু শুনেছি আপনার তেমন তালিম নেই, অথচ সাবলীলভাবে গান করেন এবং তা উচ্চ প্রশংসিত হয়।

গানের প্রথাগত শিক্ষা নেই শুধু তাই নয়, নিদেন পক্ষে হারমোনিয়াম বাজানোর ক্ষমতাটুকুও নেই আমার। রিং মাস্টার নাটকে গান গাইবার মত দুঃসাহস করতে পেরেছি পরিচালক রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়'এর নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্য। অনেকবার পালাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু রজত প্রতিবারই প্রায় আঁকশি দিয়ে আমায় টেনে এনেছে। তারপর এমন যুক্তিজাল খাড়া করেছে যে আমিও শেষ অব্দি বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলাম যে এই দু'একটা গান স্টেজে গাওয়া যেতেই পারে। নাটকে গান গাইতে পারার সমস্ত কৃতিত্ব তাই শ্রী রজতেন্দ্র'র।

■ আপনার নাট্যভাবনা বিষয়ে যদি কিছু আলোকপাত করেন...

ভালো নাটক করতে হলে ভালো নাট্যকারের প্রয়োজন সবার আগে। ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী আর শ্রী মোহিত চট্টোপাধ্যায় চলে যাবার পর আমার মনে হয় এই জায়গাটা একটু নড়বড়ে হয়ে আছে। শ্রী মনোজ মিত্র, ইদানিং, হয়তো শারীরিক কারনেই নাটক লেখা কমিয়ে দিয়েছেন। যদিও শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, শ্রী তীর্থঙ্কর চন্দ'রাও ভালো নাটক লিখছেন। আর লিখছেন ব্রাত্য বসু। বিগত দশকের শ্রেষ্ঠ দশটা নাটক বাছতে বসলে তার বেশির ভাগ জায়গাটাই ব্রাত্যর নাটক নিয়ে নেবে। এইরকম একটা ঘোলাটে রাজনৈতিক সময়কালে ব্রাত্য বসুর মতো আরও কয়েকজন নাট্যকারের বোধহয় দরকার ছিল। মৌলিক নাটকের শূন্যতা যখনই আসে তখনই নাটককে ফিরে যেতে হয় কালজয়ী দেশীয় বা অনুবাদ সাহিত্য অথবা স্বনামধন্য কোন ব্যক্তিত্বের কাছে। তারই নিদর্শন হল পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'র মত নাটক। বা অব্যক্ত, রানি কাদম্বিনী, যুগনায়কের মত নাটক।

কিন্তু নাটককে বারবার পুরনো সাহিত্যের কাছেই কেন ফিরতে হয়? নতুন লেখা, নতুন সাহিত্য কি তাহলে আর নাটককে টানছে না? এই জায়গাটাতেই একটু মন খারাপ লাগে।

■ কোন চরিত্র গঠন করতে গেলে কী কী স্টেপ নেন ?

নাটকের চরিত্র গঠনের স্টেপগুলো নতুন কিছুই নয়। বারবার করে স্ক্রিপ্ট পড়া। পরিচালকের মননে চরিত্রটার রূপরেখা কেমন আছে তাকে বোঝার চেষ্টা। আর সাব-টেক্সট গুলোকে খুঁজেখুঁজে বার করা। আমি খুব নির্ভর করি আমার সহ-অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ফিড ব্যাকের ওপর। আমার চরিত্রের চলন তাদের ধারনার সাথে মিশ খাচ্ছে কিনা জেনে নেবার চেষ্টা করি। যা আমাকে আমার চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

■ নাটক শেখাতে গেলে কীভাবে শেখাবেন দলের ছেলেমেয়েদের?

নাটক ত ওইভাবে শেখা বা শেখানো যায় না... স্তানিস্লাভস্কির 'অ্যান অ্যাক্টর প্রিপেয়ারস' বইটা আমাদের পড়া অবশ্যই উচিত। মেথড অ্যাক্টিং এর সব থেকে ভালো বই ওটাই। এছাড়া ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এই সব দিকগুলোকে শক্তপোক্ত করে তোলা যায়।

(লেখক এই মুহূর্তে কলকাতার বাংলা থিয়েটারে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা। 'যদি', 'হৃদিপাশ', 'রিংমাস্টার' প্রভৃতিতে তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শক। 'কলকাতা অপেরা' নামের সদ্যনির্মিত দলের পিছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা আছে। প্রতিবছর লেক ক্লাবে নাট্যমেলা করেন।)

মঞ্চ ও মহড়া

শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায়

"Art is not a mirror held up to reality

But a hammer with which to shape it."

---- Bertolt Brecht

আমরা যে থিয়েটার করি, তা হোলো অবসরের থিয়েটার, নানা মানুষ আসেন, কারো কাজ, ব্যবসা, পড়াশোনা, গৃহকর্ম সেরে মহড়া দিতে। যদিও আসার কোন প্রয়োজন নেই। আর আসেন, মহড়া দেন, মঞ্চে অভিনয় করেন। কখনো কখনো গ্যাঁটের কড়ি খরচ করেও থিয়েটার করতে আসেন। অবাক লাগে কিছু না পাওয়ার পরেও কেন এতো মানুষ থিয়েটার করতে আসেন? আমরা অধিকাংশই পেশাদারীভাবে থিয়েটার করি না, কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যতে করবেন, কিন্তু অধিকাংশই করি না। কিন্তু সবাই দল বেঁধে রিহার্সাল দিই, হৈ হৈ করে শো করতে যাই,আবার পরদিন যে যার নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফিরে যাই।

আসলে, আমরা খুঁজি। এই দল বলুন বা মহড়া বা মঞ্চ, আসলে নিজেদেরই খোঁজার অলিগলি, রাজপথ। বেশ কিছুদিন প্রাথমিক ওয়ার্কশপ করবার পর আমাদের মনে হলো এবার বোধহয় আমরা মঞ্চের জন্যে তৈরি, আমরা একটা প্রযোজনায় হাত দিতেই পারি। স্থির করলাম সবাই মিলে বাদল সরকারের লেখা 'যদি আরেকবার' নাটকটি আমরা মঞ্চস্থ করবো। পড়া হোল। পার্ট দেওয়া হলো। সবাইকে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হলো পার্ট পড়ার জন্যে। এবার শুরু হলো আসল কাজ 'অভিনয়'। সেই অভিনয় করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম কোথায় কি যেন একটা হচ্ছে না। সব হচ্ছে কিন্তু কিছু একটা হচ্ছে না। নাটক নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

প্রথমেই যেটা বোঝা গেলো তা হলো সমন্বয়ের অভাব। আর এই সমন্বয়ের দায়িত্ব বর্তায় নির্দেশকের ওপর। যারা অভিনয় করছিলেন তাদের কেউ ছাত্র, কেউ চাকুরীজীবী, কারো ব্যবসা, কেউ বা বেকার। প্রত্যেকে তাদের নিজেদের গণ্ডির মধ্যে থেকেই নাটকটিকে পড়ছিলেন, ভাবছিলেন। কিন্তু নাটকের তো নিজের একটা মননের স্তর থাকে, প্রত্যেক নাটকেরই থাকে। এখন আমাদের ভাবনাবোধ দিয়ে সেই স্তরটিকে ছুঁতে হয়। ঠিক তখন একটি নাটক Cacophony থেকে Symphony তে পৌঁছায়। আমরা নাটকের মননটাকে ধরতে পারছিলাম না। সবাই একভাবে ভাবছিলাম। এখানে আর একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে তা হলো অভিনেতা এবং নির্দেশকের সম্পর্ক। কাজ করতে করতে দেখেছি সব অভিনেতা নির্দেশকের ওপর নির্ভর করতে পারে না, না নির্দেশক পারেন অভিনেতাদের ওপর নির্ভর করতে। সমন্বয়ের মূল অভাব ঘটে এখানেই।

এক- একটি প্রযোজনা তো এক- একটি সন্তান ধারণের মতো, তো সেই ক্ষেত্রে নির্দেশক অভিনেতা, মঞ্চ নির্মাতা, আলোর কারিগর যারা সবাইকে একটা পরিবারের মতো দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করতে হয়। একা নির্দেশক বা খুব দক্ষ অভিনেতা বা দারুণ মঞ্চসজ্জা অথবা শুধু ভালো আলো করলে কোন নাটক দাঁড়ায় না। প্রয়োজন সবার। অর্থাৎ একটা দল। যাদের পুরোভাগে থাকেন অভিনেতা, কিন্তু নেপথ্যে যারা থাকেন তারা সমান গুরুত্বের।

আমরা কয়েকটা নিয়ম চালু করলাম। প্রতিটি মহড়ার আগে আমরা খানিক শারীরিক কসরত করবো। শরীর একজন অভিনেতার বাদ্যযন্ত্র তাকে ঠিক তারে না বাঁধলে সঠিক সুর বেরোয় না। তাই শরীরকে ঠিক তারে বাঁধতে হবে। প্রথম প্রথম সংকোচ থাকে। সকলেরই সংকোচ থাকে, কারণ আমরা বুঝতে পারি আমাদের সীমাবদ্ধতা। সেই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে সেটাকে অতিক্রম করবার চেষ্টাই অভিনয় চর্চা। ‘পারবো না’ বলে না করা খুব সহজ। কিন্তু ‘পারবো’ ভেবে লড়ে যায় যারা, তারাই প্রকৃত থিয়েটার কর্মী। একজন থিয়েটার কর্মীর কাছে ‘পারবো না’ বলে কিছু হয় না। এটাই থিয়েটারের প্রথম পাঠ। যতটা সহজে কথাটা শিখলাম, কাজটা ততটা সহজ ঠিক ছিল না। ওই যে আগে লিখলাম ‘খোঁজ’ , এই অনুশীলন আসলে নিজেকেই খুঁজতে শেখা।

‘যদি আরেকবার’ নাটকটি আগাগোড়া ছন্দবদ্ধ। সম্পূর্ণ নাটকটি ছন্দে লেখা। এখন সমস্যা হলো মাথার মধ্যে জেই ছন্দটা ঢুকে গেলো, সংলাপের স্বাভাবিকতা গেলো হারিয়ে। এবার শুরু হলো বাচিক কসরত। ছন্দে বলবো কিন্তু শুনে মনে হবে যেন স্বাভাবিক কথা বলছি। আসলে মগজ যা বলে, শরীর কথাকে সে ভাবেই প্রকাশ করে। তাই মাথা থেকে আগে বের করতে হয় যে সংলাপটি ছন্দে লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু’টি কবিতা এ ক্ষেত্রে খুব কাজ দিয়েছিলো। ‘প্রশ্ন’ আর ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’। আমরা এই দু’টি কবিতা নিয়মিত বলতাম এবং ছন্দবদ্ধ রেখেও কতোটা সহজ কথায় সাবলীল চলনে বলা যায়। সেটা অনুশীলন করতাম। এতে দুটো উপকার হয়েছিলো। এক তো আমাদের মাথা থেকে ছন্দ ব্যাপারটা চলে গিয়েছিলো, দ্বিতীয়ত সবার বলার মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরি হলো। এরপর যখন আমরা আবার নাটকটি পড়তে শুরু করলাম, এক সাথে সবটা একটা লয়ে বাঁধা গেলো।

ছন্দে লেখা নাটক তৈরি করবার জটিলতা হলো সঠিক সময়ে পজ নেওয়া বা কখনো খুব দ্রুত সংলাপ বলে আবার গতি কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু কখনোই যেন সেটা আরোপিত না মনে হয় বা কোথাও যেন ছন্দপতন না হয়। এর জন্যে প্রয়োজন কণ্ঠ এবং প্রক্ষেপণের ওপর নিয়ন্ত্রণ। এখন মুস্কিল হলো, আমরা কেউ জোরে কথা বলতে শিখিনি। শেখানো হয় না আজকাল। বরং বলা হয় আস্তে আস্তে কথা বলতে। এই আস্তে বলার অভ্যাস কাটিয়ে কণ্ঠকে বিভিন্ন পর্দায় ঠিক ঠিক গলা লাগাতে জানাটাও একজন অভিনেতার দক্ষতা। এখানে হারমোনিয়াম খুব সাহায্য করেছিলো আমাদের। দীর্ঘদিন আমরা বিভিন্ন স্কেলে সরগমের রেওয়াজ করেছি যেতে উঁচু পর্দায় কথা বললেও যেন আমাদের সংলাপ উচ্চকিত মনে না হয়।

এতো গেলো আমাদের অনুশীলনের কথা। যারা নাট্যচর্চা করেন তাঁরা সবাই এই অনুশীলনের কথা জানেন, করেনও। এইবার এলো আসল মজা। আমাদের মগজটা তো দৈনন্দিন ঘানিতে পিষতে পিষতে প্রায় ছিবড়ে হয়ে গেছে, তাই গতানুগতিক কিছু ভাবার সময় মগজে যে চাপ পড়ে সেটা সব নাট্যকর্মী নিতে পারেন না। ফলত, তাঁরা নিজেদের থেকে পালাতে থাকেন। আমরা সবাই অবশ্য নিজেরা নিজেদের থেকে পালিয়ে থাকি। কিন্তু যারা অভিনেতা বা অভিনেতা হবেন বলে ভাবেন, তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হলো তারা নিজেরা। অভিনয় চর্চাটি একেবারে নিজের সাথে নিজের লড়াই। প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করা আমি কোথায় আটকাচ্ছি, আর প্রতিনিয়ত ভাবা আমি সেই প্রতিবন্ধকতা কেমন করে অতিক্রম করবো। এই যে রোজ নিজের সামনে নিজে দাঁড়ানো, এটা একটা সময়ের পরে খুব ভীতিপ্রদর্শক। যদিও এর সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও আছে। আমাদের ছোট থেকে একটা Comfort Zone তৈরি করে দিয়ে বলা হয় সেই গণ্ডির মধ্যেই বাঁচতে হবে। এখন নাটক বা অভিনয়কে তো আর সময়, কাল, আর্থসামাজিক অবস্থানে বেঁধে রাখা যায় না। ধরুন আমি খুব উচ্চপদস্থ অফিসার, পেলাম একটা

গরীব চাষীর পার্ট। আমাকে তো সেই চাষির জায়গায় নিজেকে ভাবতে হবে। থিয়েটারের ভাষায় যাকে বলে Empathy। এই Empathy –র প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ইগো।

একটি চরিত্রের মননে মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে নিজের অহংবোধ আগে ত্যাগ করতে হবে। অনেকটা সংসারী সন্ন্যাসীর মতো। সব থাকবে, কিন্তু নির্লিপ্ত। পার্থিব, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে মানুষের মনের গভীরে আরও গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করাই অভিনেতার একমাত্র লক্ষ্য। মানুষ বিনা তো থিয়েটার হয় না।

এখানেই অভিনয়ের আসল মজা। প্রথমেই লিখেছিলাম একদল মানুষ, একটা সমন্বয়, একটা খোঁজ। অনেক মানুষের মধ্যে, অনেক চরিত্রের মধ্যে নিজেকে খোঁজা। একদম ক্ষ্যাপা পাগলের মতো। তাই এই শিল্পটা এতো জ্যান্ত। আড়াই হাজার বছরেরও বেশি একটা শিল্প সমানভাবে বেঁচে আছে শুধু মানুষের ওপর নির্ভর করে। হয়তো সভ্যতা থাকবে, মানুষ থাকবে, থিয়েটারও থেকে যাবে।

আব শেষে বলি, যে নাটক নিয়ে ওপরের আলোচনাটি করলাম সেই নাটক আমরা মঞ্চস্থ করতে পারিনি। কিন্তু এই মহড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক শেখা এখনো বাকি।

(লেখক বিশিষ্ট অভিনেতা। বিভিন্ন নাটকের দলে বহুবছর অভিনয় করলেও এখন ‘অ্যাকটো’ নামে একটি দলের মূল হোতা। যে দল কলকাতার বুকে মাত্র একবছরের মধ্যেই তাদের নাটকের মাধ্যমে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।)

And all the hard work paid off when the playwright himself appreciated the tunes!

An “immortal” rendezvous – with music!

Aronya Baksy

Directing a full stage production is not an easy job. There are many variables to be managed, such as individual costumes, props, along with sets, lights, scheduling rehearsals, and the like. It is no wonder that the occasional frustration may pop up, and who better to take it out on than the youngest member of the troupe- the music director.

Composing music for any play, let alone a complicated epic like ‘Na Maron’ is not easy. It takes endless reserves of patience, calm and a firm grip on one’s temper. There are frustrating moments where nothing seems to fit, interspersed with moments of poetic and musical brilliance which make up for all else. The director’s constant and nagging comments on every aspect of the musical process seem to incense the temper even more. The rehearsals are even worse; with so many issues to handle, the music (often seen as a secondary concern against the acting and emotional aspects) takes a beating as the beats don’t line up, the singers are off key, and there is an atmosphere of general tension. And as the frustrations build, the singers go further off tune (to the extent that the harmonium and flute play in the key of A and the singers sing in the key of D) and there is nothing that seems right. Decisions consciously and carefully taken at music rehearsals are undone spontaneously, and a heated exchange of ideas and words ensues.

After what can be called a motivational speech, efforts are stepped up big time. Tea breaks between rehearsals are sacrificed as the music team hangs back to practice while the remainder of the cast enjoys their tea along with their chit-chat and the obligatory smoke. It takes a few team meetings and motivational speeches (from the director, who else) before, with only a few weeks to go, the musicians, the instruments and the beats line up in full sync. Everything seems at peace, but of course, the endless rebukes of the director never stop. That, along with the half-hour tea breaks in between the rehearsals, are what make these rehearsals so much fun.

Helping the music team for a mega production like Na Maron has been one of the defining experiences of my short but eventful career on the stage. I cannot think of a better way to learn the virtues of patience, perseverance and the ability to listen. And all the hard work paid off when the playwright himself appreciated the tunes!

ABOUT SEPAI

SEPAI, that is **Society for Energizing Performing Arts among every Indians**, was conceptualised in 2015 with the intention to trigger the creative energy among everyone. Be it theatre, or dance or music, SEPAI wanted everyone to experience and celebrate art in their life.

SEPAI is passion driven towards a common goal of bringing in more people on the same side of the curtain. Cultivating and nurturing art is of prime focus. A human life is less meaningful and certainly less colourful if we do not use our faculty to imbibe Art.

SEPAI's past activities have included conducting theatre workshops, script writing workshops, workshops for children, producing several theatre performances involving emerging artists, developing skills through self-studies, hands-on workshops in stage lighting, set making, dress making, makeup, and providing support and assistance to other theatre groups.

SEPAI has laid the ground for amalgamation of creative minds and their ideas, artists and thinkers, performers and audience alike. What started in 2000 has grown bigger presently and SEPAI aims at continuing its quest to bring more and more people within the spectrum of Performing arts through support, training, provide infrastructure and lots of encouragement.

We cordially invite every individual to join us and be part of our vision and journey.

CONTACT DETAILS:

https://sepai.org/

https://www.facebook.com/enadbangalore/

enadtheatre@gmail.com;
Mobile: +91 98458 95365

বাদল সরকারের নাটক
অমিতাভ বকসীর পরিচালনায়

পাগলাঘোড়া

December 17th, Sunday
3:30 PM and 7:00 PM
venue: ADA Rangamandira